বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ- অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯ -- ৯ই পৌষ, ১৪১৬

মুদ্রণ--মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

অধ্যাত্মবাদ কি? অধ্যাত্মবাদের মূল কথা কি? অধ্যাত্মবাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুক? তা আমাদের বিশদভাবে জানতে হবে। যার মধ্যে মন আছে, যার মধ্যে চিন্তা আছে, দেহের মাধ্যমে যে যা কিছু করছে, সেটাই আধ্যাত্মিক; সেটাই অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোন গল্প, কল্পনা, ভাব আর উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। অধ্যাত্মবাদ দেহতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিজেকে জানলে, বিশ্ববিরাটের সুরের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করলেই সব কিছু জানা যাবে। অধ্যাত্মবাদের মূল লক্ষ্যই হল সর্বমানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা, আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া। সেখানে নিজের বলে কিছু থাকবে না। অধ্যাত্মবাদের মূলেই আছে বিশ্বপ্রকৃতি যে নির্দেশে, যে ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার সঙ্গে মহামিলন। এই মিলনের সংযোগকারী সেতু হল অহিংসা, ত্যাগ, প্রেম, ভালবাসা ও মানবতাবোধ। আর এইগুলোই হল সর্বশক্তির আধার।

অধ্যাত্মসাধনার কাজই হলো, সকল দিকে সবাইকে সচেতন করে তোলা; আত্মসচেতন হওয়া। অধ্যাত্মবাদের একটি দিক হলো আত্মা সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ক। ব্রহ্ম হল বিরাট—পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমের) সবকিছু নিয়েই সে বিরাট। এই পঞ্চভূত হতেই জীবজগতের সৃষ্টি। সেখানেও বাস্তব ছাড়া নয়। অতএব আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মিক জগৎ, প্রাকৃতিক জগৎ ও জীবজগৎ, সব কিছুই আসছে। আবার জীবজগতের মধ্যে আছে ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন নীতিই অধ্যাত্মবাদের, আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। এই সচেতনতাটা যদি জীবের মধ্যে জেগে ওঠে, তবেই হবে অধ্যাত্মবাদের পূর্ণতর রূপায়ণ।

মানুষের মঙ্গলের জন্যই মতবাদ। মতবাদের মঙ্গলের জন্য মানুষ নয়। এই পৃথিবীতে যত মতবাদের প্রচার হয়েছে, তার মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের মঙ্গলকামনা। বাস্তব (বস্তুবাদ) ও অধ্যাত্মবাদ—একে অন্যের পরিপূরক, একই সূত্রে গাঁথা। দুই মতবাদেই মূল লক্ষ্য হলো, সর্বমানবের, সর্বজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন—যদিও দুই মতবাদে চিন্তা ভাবনা, প্রয়োগ প্রণালী, ধ্যানধারণা ও কাজকর্মের প্রকার ভেদ হতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যাঁদের আমরা ভগবান্, আল্লা, গড্ বলে থাকি, তাঁরা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছেন। আবার কার্লমার্ক্স, লেনিন, মাওসেতুং, হো-চি-মিন, মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকরা মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

অধ্যাত্মচেতনার পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। সমাজ সংসারকে নিয়েই আমাদের অধ্যত্মচেতনা। সমাজ সংসারের সার্বিক উন্নতিকল্পে আমাদের দেবদেবীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। মহাভারতের যুগে মহাপ্রেমিক মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, সমাজ জীবনে সর্বত্র মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে। সমাজপতিরা স্বৈরাচারী হয়ে সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। এই অবস্থার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন এক আমূল পরিবর্ত্তন। যার পরিণতি অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ। তিনি জানতেন, যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বতোভাবে। তাই তিনি যুদ্ধ না করে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্লব যা ঘৃণধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে এক নূতন শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই চেয়েছিলেন।

বাস্তববাদীরা মানবতার জয়গান করেছেন। অধ্যাত্মবাদীরাও বাস্তবে বৃহৎ গঠনমূলক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। বাস্তব জীবনে সমাজ-সংস্কারকরা চেয়েছেন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা—সেখানে ধনীদরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য দূরীভূত হবে। মানুষের মধ্যে আসবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে সমস্ত শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হয়ে সমস্ত সমাজ হবে এক অখণ্ড জাতি। সমস্ত সমাজ হবে একসূত্রে গাঁথা।

বস্তুবাদই বেদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বেদের ধর্ম বাস্তবের ধর্ম। সেখানে আছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, শোষণমুক্ত সমাজগঠনের কথা, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা। জন্মগত অধিকার নিয়েই এই সাম্যবাদ। প্রকৃতি স্বয়ং সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মানুষের মাঝে বাস্তবের ধারায় অধ্যাত্মবাদ ও সাম্যবাদের সচেতনতার সুরটি জাগিয়ে তোলার জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের ২৮-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **'বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ।'**

পরিশেষে জানাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম।**

শুভ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫০তম নির্বিকল্প
সমাধিভঙ্গের দিবস উপলক্ষ্যে

৯ই পৌষ, ১৪১৬ — *চপল মিত্র*
ইং ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

আধ্যাত্মিকতা বাস্তব ছাড়া নয়

১৯শে মার্চ, ১৯৬৭
৪৬নং, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা

আজ একটু অন্যরকম আছি। কথাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে গেছে। আমাকে চারিদিক থেকে টানছে। এত লক্ষ লক্ষ লোক আছে। তারা সব সাধনা করছে। আমাকে ডাকছে। ফোনে যেমন ডাকে, হ্যালো, হ্যালো। 'হা গুরু', 'হা গুরু' করছে, বুকে ফটো নিয়ে। হ্যালো, হ্যালো, খুব ডাকছে। কথার মাঝখানে লিঙ্ক (link) হারিয়ে যায়। কথা উলটপালট হয়ে যায় অনেকসময়।

আমরা শূন্যে ঘুরছি। এই পৃথিবীতে সব ডিগবাজী খাচ্ছে। সারাক্ষণ কত কিছু করছো। তবু বলছো, তোমরা কিছুই বুঝ না। যাই হউক, সবসময় নীল আকাশটা ঠিকই মাথার উপর দেখতে পাচ্ছ। ঐরকম আরও পৃথিবী ঘুরছে। এই যে পৃথিবী, তার বিরাট আয়তন নিয়ে ঘুরে চলেছে বিরামবিহীনভাবে, কি তার স্বার্থ? পৃথিবী তার নিজের স্বার্থে নিজস্ব কক্ষে ঘুরছে। সময় তো আর নাই।

প্রকৃতির তত্ত্ব, মহাশূন্যের তত্ত্ব আমি দিয়ে গেলাম। ঝট করে দিলাম। ঝড়ের মত কিছু বলে যাই। এটা ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠের মত নয়। বুঝুক না বুঝুক, শুনলেও আপনি কাজ হয়ে যাবে। চিন্তা করবে। চিন্তা করলে মনে গেঁথে যায়। মনন করলেই ভিতরে ভিতরে স্ফূরণ হয়ে যাবে। এইরকম বহু মহান আসেন। বোঝাই করে নিয়ে চলে যান। গাড়ী আছে, মালগাড়ী; তাইতে করে বোঝাই করে নিয়ে যান। বেশীরভাগেরই জপ তপ করে, সাধনা করে, নেওয়ার সময় হয় না, তা তাঁরা সবাই জানেন। তাই বগি আছে, তার মধ্যে ভরে নিয়ে যান। কাজেই কথা হচ্ছে, একটু স্মরণে রেখে দিতে হয়; জপ তপ করতে হয়।

বিরাট বিরাট সুন্দর সুন্দর পৃথিবী আছে। তবু এটা কল্পনায় থেকে

যাচ্ছে। কল্পনার মতো মনে হচ্ছে, কাজেই বলি না। তবে একটা বাপ থাকলে, তারও বাপ থাকবে। একটা সূর্য থাকলে আরও সূর্য থাকবে। সেইরকম একটা পৃথিবী থাকলে আরও পৃথিবী থাকবে। এটাই নিয়ম। সেই সমস্ত পর পর পৃথিবী বেশ আছে। একটু আনন্দ যদি একদিনও পাও, চির আনন্দের মাঝেও থাকতে পারো। এই যে নরকপুরী বলে কথা আছে, সেরকম পৃথিবীও আছে। ঐ যে আছে যতরকম কথা, একটাও বৃথা যাবে না। আমাদের দেহে যতরকম অনুভব বা ব্যথা আছে, তত রকম পৃথিবী আছে। দুঃখের পৃথিবী আছে, সুখের পৃথিবী আছে। কাজেই একটু আনন্দ যদি পাও, সেই পৃথিবীতে যাবে। আনন্দময় পৃথিবীতে যাবে।

একটা জীবনও নষ্ট হয় না। একটা জীবও মরে না। কেউ মরে না। রূপের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। আগুনেই দিক, আর যেখানেই দিক, মৃত্যু তার নেই। কাজেই তোমাদেরও মৃত্যু নেই। যদি নেই, তবে যায় কোথায়? যতদিন না সেই পরমানন্দে যাও, যেখানে মহানরা আছেন; যতক্ষণ না সেই যোগাযোগে যুক্ত হয়ে যাও; এই ছকে পড়তে হবে। এটাই নিয়ম। তবু 'বুঝ' হচ্ছে না কেন? হচ্ছে, তবে এটি বুঝতে পারছো না। বুঝায় (বুঝতে পারা যায়) কিছুটা।

স্বপ্নে বুঝিয়ে দিচ্ছে। মনটি সবসময়ে যে দেহের মধ্যে থাকে, তা নয়। মন কখনও এ গ্রহে যায়, কখনও আরেক গ্রহে যায়, কখনও চাঁদে যায়, কখনও সূর্যে যায়। মন সীমাবদ্ধ না থাকলে, যে যে পৃথিবীতে যতদূর পর্যন্ত মন যেতে পারে, দেহ নিয়ে সেই সেই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সম্ভব। মন হতে ধাতু হয়। ধাতু হতে সৃষ্টি হয়। দেহেই পাত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে যা কিছু দেখছো, সবটাই মন। যেখানে যাও, যে যে জায়গায় যাওয়ার আছে, ইচ্ছা করলেই তোমার দেহ নিয়ে সেখানে বিরাজ করতে পারো।

ক্ষণিকের পাত প্রতিমুহূর্ত্তে হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনাই হয় না। এতে সৃষ্টি হচ্ছে না। তবে যখন তুমি ধারণ করে (ধ্যান করে) ধ্যেয় বস্তুকে ধরে রাখতে পারবে, সেই ভাবটা যদি দেহে প্রতিষ্ঠিত

(ধারণ) করতে পার, তবে সৃষ্টি হবে। ভাবতে গেলেই ভাবনার জায়গায় বাসস্থান হয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহের ভাবনা যদি থাকে তোমার অন্তরে, তাহলে তোমারও সূর্যে এবং চন্দ্রে বাসস্থান রয়েছে। সমস্ত জায়গায়ই সমস্ত গ্রহে উপগ্রহে তোমার আস্তানা রয়েছে।

গতিই হচ্ছে আমার ট্রেন। মহাশূন্যের মহাকাশের অনন্ত গতির গতিতে জগৎ চলেছে। ঐ গতির সাথে আমি আমার মনকে মিশিয়ে দিয়েছি। জীবকুলের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এই গতির মাঝে চলে যাচ্ছে। যদি আমি মনের চেন টানতে পারি, আমি সূর্যে থাকবো, চন্দ্রে থাকবো। যদি চেন টানি, অনন্ত আকাশে যেখানে যাই, সেখানেই বসে যেতে পারি।

আগে কর **মনন**। মনে মনে ঠিক করো, ''অমুক জায়গায় যাব'', তবেই তুমি যাত্রা করো। চক্ষু দিয়ে যতদূর যাও সেটাই হ'ল সসীম। তারপর চক্ষু বুঁজেও যতদূর যাও, তাও সীমানায় এসে গেছে। তুমি সংসার করছো, ঘর করছো, পৃথিবী শূন্যে দুলছে। প্রতিমুহূর্ত্তে মন অস্থির; যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সেই বাসস্থান, সেই আস্তানায় বসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন ধু ধু করে ছুটছে। কেন? সে (মন) বসতে চায় সেই পরমানন্দের পৃথিবীতে। এখানে অন্য কোথাও সামঞ্জস্য করতে পারছে না বলেই ঘুরছে। আমরা তৃপ্তির পথের পথিক। সেই গতির সঙ্গে একগতি করার জন্য তৃপ্তির সন্ধানে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের সাধনা।

যার মধ্যে মন আছে, যার মধ্যে চিন্তা আছে, দেহের মাধ্যমে যে যা কিছু করছে, সেটাই আধ্যাত্মিক (দেহমধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্মম্)। আধ্যাত্মিকতা বাস্তব ছাড়া নয়। ধর্ম সম্পূর্ণ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থেকে আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে কর্ত্তব্য, সেটাই ধর্ম। কর্ত্তব্যের মধ্যে নিযুক্ত থেকে যে যা কিছু করছে, সেটাই ধর্ম। আশ্রমে চলে যাওয়াই ধর্ম নয়। এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞরা অনেকে সংসারে মায়া মোহ কাম ত্যাগ করতে বলেছে। এগুলি কি খুচরা ত্যাগ? প্রকৃত ধর্মে কোন বর্জন নেই। ত্যাগ একটাই, যেটা ছাড়তে ছাড়তে একেবারে দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করে (মৃত্যু) চলে যাবে। আলাদা করে কিছু

ছাড়তে হয় না।

মানুষ যদি সবচেয়ে বড় (শ্রেষ্ঠ) হয়, তাহলে ব্রহ্ম বলতে যে বিরাট, অনাদি অনন্ত বুঝায়, সেই সুর তোমার মধ্যে নেই কেন? সমস্ত জাতির সমন্বয়ের সুর নিয়েই ধর্ম। তুমি ধর্মকে ওদের (পাখী, জীব, জন্তু) থেকে বেশ আলাদা করে দিলে। একটা মানুষের মধ্যে যা আছে, একটা পিঁপড়ার মধ্যেও তা আছে। একটা বাবুই পাখি, কি সুন্দরভাবে তার বাসা তৈরী করে। কোথায় মিষ্টি আছে, তুমি বলতে পারবে না। একটা পিঁপড়া, একটা আরশোলা ঠিক সেখানে চলে যাবে। একটা কুকুর গন্ধে কোথায় কোথায় গিয়ে খুনীকে ধরে ফেলছে। তোমরা বলবে, ইনষ্টিংক্ট (সহজাত বৃত্তি)। এই 'ইনষ্টিংক্ট' যেখানে আছে, 'টিউন' (প্রকৃতির সুর) সেখানে বাঁধা। কার মধ্যে কোন্ শক্তি লুক্কায়িত আছে, কেউ বলতে পারে না। আমাদের ধর্ম সাপ, ব্যাঙ থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে। **সাপের মধ্যে আছে বিরাট যোগ শক্তি; একে বলে ত্রাটক যোগ। সাপ শীতের সময় সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে ত্রাটক যোগে বায়ু থেকে আহার গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। সাপের মধ্যে যে অসাধারণ অন্তর্যামিত্ব রয়েছে, দূর থেকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে, তা আয়ত্ত করতে তোমার অনেক সময় লাগবে।** তাই তো দেবাদিদেব মহাদেব সাপকে করেছেন অঙ্গের ভূষণ (অলঙ্কার)। একরকম পোকা আছে, তাকে আক্রমণ করতে গেলে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। অন্য অন্য রূপ নিয়ে নেয়। এই যে শক্তি, একে বলে 'অণিমা' শক্তি। শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অষ্ট সিদ্ধির একটি।

স্রষ্টা নিজের ঔন্মাদনার উন্মত্ততায় সৃষ্টি করছেন। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই কাম। ভগবানকে সেবা করতে চাই, মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে চাই; এই যে আত্মতৃপ্তি, এটাও কাম। তোমার মধ্যে ভালো লাগার বোধ, তৃপ্তিবোধ সবই আছে। গভীর আত্মতৃপ্তিই কাম। তাই কাম কেহ বর্জন করতে পারেনি। কাম বর্জন করা যায় না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

দেহের মাঝে সীমাবদ্ধ আছ তোমরা সবাই। আবার দেহ ছেড়ে যেদিন চলে যাবে, নিজের সীমা নিজেই খুঁজে পাবে না।

পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭

যুগ পরিবর্ত্তনে অবস্থা ভেদে নানান অবস্থার সৃষ্টি হয়। চিরকাল একভাবে থাকে না। একমাত্র সত্য যেটা, চিরযুগে একভাবে থাকে। এখানে যে মুনি ঋষি বাল্মীকি বা বিশ্বামিত্রের কথা বলা হ'ল, সেটা সমাজ রক্ষা বা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন মুনি ঋষিকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যবস্থা চলতো। কোন কোন মুনি স্বয়ং আদৌ ছিলেন কি না, খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন বাল্মীকি, একজন বিশ্বামিত্র, এই যে ভিন্ন ভিন্ন নামগুলো, এটা তো কেহ নিয়ে আসেনি। এখানে (এই পৃথিবীতে) বুঝবার সুবিধার জন্য নামগুলি দেওয়া হয়েছে।

এই যে 'রাম', এর নাম। এই ব্যক্তি যখন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুরূপে জন্মগ্রহণ করলো, আমরা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নামকরণ করলাম, হাত, পা ইত্যাদি। কিন্তু স্রষ্টা বা প্রকৃতির নিয়মে যে সৃষ্টির ধারা চলেছে, তাতে এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কি কোন নাম ছিল? তিনি কি নাম দেবেন? এখানে হাত, পা ইত্যাদি বলে প্যাঁচ পুঁচ দিয়ে দিলাম। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন ছিল, ধরে নেওয়া যাক, এই পৃথিবীতে সেটার একটা নাম আছে। ইঙ্গিত হচ্ছে, বুঝবার জন্য যেটা হয়, সেটাই সত্য। বস্তু যখন আছে, কি নামে অভিহিত ছিল? যে নাম আমরা বলি, সত্যিকারের সেই নামই ছিল কি না। **আজ যে মহাভারতের কত কত কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বলি; যেসব কথা আছে মহাভারতে, সেটা কোন্ যুগে কার কথা ছিল? অন্তরে স্ফূরণ হয় যেটা, মন যেটা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, তিনিই শিব।**

এই যে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদি দেবতাদের যে বর্ণনা, সেটা কিভাবে এল? চিরকালের যে যোগাযোগ, সেই যোগাযোগসূত্র ধরেই আসছে, ফুটে উঠছে। কোথায় ছিল কালী? কোথায় ছিল শিব? কেহ জানতো না। বাস্তবে রূপের মাধ্যমে এনে বর্ণনা করলো। কৃষ্ণ বা রাম বা শিব— তাদের যে বর্ণনা, তাদের কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধে দেহের মধ্যে এনে যদি ফেলি, তবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এক ধনীর বাড়িতে পুতুলের বিবাহে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে তত্ত্ব নিয়ে সব চলছে। কার বিবাহে এত সমারোহ তখনও কেহ (অন্যান্য লোকজন) জানে না। তারপর পাল্কি নিয়ে আসছে। পরে সবাই দেখবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারমধ্যে দেখে পুতুলের বিবাহ হচ্ছে। পাল্কির মধ্যে, পুতুল বর কনে। সবাই বলে, 'বাবা, এই ব্যাপার।' অমুক বাড়ীর পুতুলের সাথে অমুক বাড়ীর পুতুলের বিবাহ। একশো বছর পরে গ্রন্থে লেখা হয়ে গেল, অমুক কুমারের সঙ্গে অমুক কুমারীর বিবাহ হ'ল। তাদের যে বর্ণনা, বাস্তব রূপকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেল। কারণ তারা পুতুলের বর্ণনা করে গেছেন।

আজ যে কৃষ্ণ, কালী বা রামের কথা বলি, তাঁদের আমরা কিভাবে বর্ণনা করছি? পুতুলের ভিতর দিয়ে বর্ণনা করছি। পুতুলে যখন আনি, তখন বর্ণনা বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষে যখন আনি, তখন সীমাবদ্ধে এসে যায়। সমাজের বিচক্ষণরা তৎকালীন সমাজে তাদের মনের উন্মাদনায়, যোগ, ধ্যান ধারণায় দেবতা সৃষ্টি করলেন; বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন। দেবতা কোথায়? কালী, কৃষ্ণ, রাম দেখতে পাবে কিভাবে? পিছন থেকে আলোর ফোকাসে চলচ্চিত্র যেমন দেখায়; খালি দেওয়ালে ছবি যেমন প্রতিফলিত হয়; সেই চিত্রের মতন রূপ ভেসে ওঠে। কি করে এল? কিভাবে এল? কোন্ ভাবে এল? যখন উপরে বাজী ফুটে মালা হয়ে বের হয়, বাজীতে রাম হয়ে যায়। কখনও কৃষ্ণ হয়ে যায়; নানা রূপ হয়ে যায়। তাকালে দেখায় ধূম্রমূর্ত্তিতে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম সব দেখা যায়। তাহলে এঁরা কোথায় ছিল? ব্যোমে (আকাশে)। এই

বোম (বাজী) যখন ব্যোমে (আকাশে) ফাটলো, নানা রূপ নিয়ে নিল। এই ব্যোম হচ্ছে আকাশ। এই ব্যোম হচ্ছে মহাশূন্য। এই শব্দ ধ্বনিতে যখন প্রস্ফুটিত হলো, নাম ধ্বনিতে যখন প্রস্ফুটিত হলো, তখন অদ্ভুতভাবে আকাশে রূপ নিয়ে নিল। আসলে 'নাই' আবার 'আছেন'-এর মধ্যে 'নাই'-এর রূপ নিয়ে তিনি বিরাজ করছেন আকাশে। বিষ্ণুরূপে দাঁড়িয়ে আছেন আকাশে। কিভাবে এলেন? আমাদের মতন মনে হলেও তিনি ঊর্দ্ধে। তাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তবে দেখা যায়। তিনি কি করলেন? শব্দ যখন হলো, রূপ নিয়ে নিলেন।

আগে অদ্ভুত অদ্ভুত বাজী তৈরী করতো। আজকাল আর হয় না। রামের বাড়ী; রাম বের হলো। শিব আসছে। শিব এসে পার্বতীকে আশীর্বাদ করছে ইত্যাদি। তারা সুরের ভিতর দিয়ে, ধ্বনির ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতো। হরিণ আসলো; সোনার হরিণ। সীতা রামকে সোনার হরিণ ধরে দিতে বললো। রাবণ আসলো। সীতাহরণ করলো। এই যে বর্ণনা, এই যে তৈরী করা; তবু যেন মিশে যাওয়া আগুনের মধ্যে। বাজীর আগুনেই সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হনুমানের বক্ষে তৈরী করেছে রামের মূর্ত্তি। হনুমান বার্স্ট করলো। সৃষ্টি হ'ল রাম। হনুমানের বুক চিরে রামসীতার সৃষ্টি হ'ল। হনুমানের ভিতর যে রাম রাম ধ্বনি ছিল, সেই ধ্বনিতেই রাম সীতার সৃষ্টি হ'ল। কে প্রতিষ্ঠা করলো রামকে? হনুমান। স্ফূরণ যখন হ'ল, মন যখন বার্স্ট করলো, তখন কৃষ্ণ এল, হরি এল, বাল্মীকি এল, বিশ্বামিত্র এল। তাঁরা কিভাবে এল? কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করলেন কে জগতে? হরিকে প্রতিষ্ঠা করলেন কে? আগুনের বারুদের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা এল। এমনি লীলাখেলা নয়। রূপ যখন প্রকাশ হ'ল শব্দের ভিতর দিয়ে, ধ্বনির ভিতর দিয়ে, আকাশে বিরাট আকার নিয়ে নিল।

এই যে ভূলোকের, এই যে পৃথিবীর বর্ণনা, এইটাও ঠিক তাই। সূর্যের থেকে স্ফূরণ হলো। এটা কিসের রূপ? এই যে অগণিত জীব, অগণিত মাথা, অগণিত হাত, পা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো? সূর্য থেকে। আগুনের কুণ্ড থেকে। সমস্ত কণিকা থেকে বিস্ফোরণ হয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে

রূপ নিল। কিন্তু লীন হয়ে যাচ্ছে সবাই মহাকাশে। আমরা সেই সূর্য থেকে, আকাশ থেকে বেরিয়েছি। আবার শিশু থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ লীন হতে হতে ৬০/৭০ বছর পরে একেবারে মিশে যাচ্ছি। আমরা আকাশপানে তাকিয়ে থেকে মিশে যাওয়ার পদ্ধতিতে ক্রমশঃ মিশে যাচ্ছি।

পৃথিবীর উপর আমরা কি করছি, সূর্যলোক হতে দেখছে। যেমন বোমের বিস্ফোরণ হ'ল, রামের বাড়ী হল ঐ ব্যোমে, ঐ আকাশে। ব্যোম থেকে এই পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল। এত অজস্র জীব, পাহাড়-পর্বত, কত গাছ গাছড়া পৃথিবীর বুকের উপর ভাসছে। এখনও আছে। কোটি বছর যাক। তাঁর কাছে নিমেষ মাত্র। কি পাচ্ছে? এক শ্রীরাম, এক শ্রীকৃষ্ণ; সব সত্য, সবাই সত্য, সবাই বুদ্ধ। এই যে বুদ্ধ অবস্থা; নিত্য অবস্থা। এটা বাল্মীকি হোক আর বিশ্বামিত্র হোক, সবাইকে নিয়েই বিষ্ণু। একটা বীজ থেকে এত মন, এত বিষ্ণুর সৃষ্টি হয়েছে। বিষ্ণুর বর্ণনা কি? সেই অসীম, সেই বিরাট, সেই অনাদি অনন্ত মহাকাশ। যত জীবজগৎ যত জীবজন্তু— সকল বিষয় বস্তুরই মন বিষ্ণু। বিরাট বস্তুরই মন; এতগুলো মন, তাঁরই মন, তাঁরই বর্ণনা এত বড়। তাঁর থেকেই সৃষ্টি হল মুনি, সৃষ্টি হ'ল ঋষি। শিশু থেকে বার্ধক্য, মুনি, ঋষি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে জগৎকে সৃষ্টি করেছে।

আমাদের যে রূপ, বিষ্ণুরই রূপ। এই যে খণ্ড খণ্ড নামে যে রূপ, অখণ্ডেরই রূপ। কেউ খণ্ড নয়। শুধু মাত্রাগত ভেদে বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাধারার পার্থক্য। নিজস্ব থেকে আবার যে অখণ্ড; পার্থক্য থেকে সেই একত্বেরই সাড়া। পায়ের তলায় মাটির নীচে সাগর, উপরে সাগর, আবার মাথার উপর সাগর। এই তিন দৃশ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেও মরুভূমির মাঝে রয়েছি বলে মনে হয়। এই যে সাগর, সর্ব অবস্থায় ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। এ কে করতে পারে? তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এটা বিষ্ণুর পক্ষেই সম্ভব। তিনি কি করলেন? এই ভূলোকে, এই পৃথিবীতে চক্র ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তোমাদের সত্তা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। তাই পৃথিবী তোমাদের পায়ের তলে। পৃথিবীর গর্ভের উপর কে দাঁড়াতে পারে? যে পৃথিবীকে তোমরা পূজা কর, তাকে

তোমরা পদ দিয়ে সেবা কর। আবার তাকে তোমরা প্রণাম কর। কুমোর যেমন পা দিয়ে মাড়িয়ে প্রতিমা সৃষ্টি করে; আবার হাতজোড় করে মাথা নত করে প্রণাম করে, 'মা, তুমি রক্ষা করো।'

আমরাই ঋষি, মুনি। আমাদের মধ্যে দেব দেবতাদেরই রূপ। খণ্ডের মাঝে আমরা হাবুডুবু খাই। এই হাবুডুবুর মাঝে থাকলেও এটা অখণ্ডেরই রূপ। রামায়ণ শুধু গ্রন্থে নয়; মহাভারত শুধু গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব কিছু নিয়েই রামায়ণ, সবকিছু নিয়েই মহাভারত। বাস্তবের সব বিষয়বস্তু নিয়েই রামায়ণ, মহাভারত। যারা মাটি হতে বের হয়ে মাটির গর্ভে লীন হয়ে যায়, তারাই বাল্মীকি। সেভাবেই আমরা তৈরী। সেই তেজ, সেই সুর অখণ্ডেরই সত্তা। এই যে তেজ, এই তেজ হতেই আমরা এসেছি। আবার তেজেই লীন হচ্ছি। জীবজগতের মাঝে মাত্রায় মাত্রায় এই যে ব্যবধান, এই ব্যবধান সত্যিকারের নয়। অখণ্ড রূপকে বুঝাবার জন্য এই ব্যবধান। নিজের সত্তায় নিজে বুঝবার জন্য, অখণ্ডকে বুঝবার জন্য এই ব্যবধান। এটাই নিয়ম। যেই চোখ দিয়ে পুকুর দেখ, লেক দেখ, সেই চোখ দিয়েই সাগরও দেখছো। আজ তোমরা এপার হতে ওপার দেখছো। যখন অখণ্ডের পারে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন আর ওপার দেখা যাবে না। যখন ওপার আর দেখবে না, তখনই অখণ্ড। তুমি সেই অখণ্ডেরই রূপ। দেহের মাঝে সীমাবদ্ধে আছ তোমরা সবাই। আবার দেহ ছেড়ে যেদিন চলে যাবে অসীম নীলাকাশে; নিজের সীমা নিজেই খুঁজে পাবে না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমাজজীবনে বাস্তবক্ষেত্রে যে যা কিছু করে, দেখে শুনে বুঝেই সবকিছু করে।

লেকটাউন
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮২

আমাদের একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন্ বিষয়ে? তার আগে বলছি যে, আমি কাউকে কোন দোষারোপ করতে চাই না। কারও বিরুদ্ধে সমালোচনাও করতে চাই না। সমালোচনা করা আমার ধর্ম নয়। যতটুকু আলোচনা করি, কোনকিছু জানতে এবং জানাতে। আমরা কোন কাজ যখন করি, কাজের আগে ফলাফল সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হই। এইকাজে কতটা ফল পাওয়া যেতে পারে এ নিয়ে আমরা আলোচনা করি। অযথা খাটলাম, ফলের দিক থেকে শূন্য। অনর্থক ঐ বেগার খাটুনি করার সার্থকতা কি? আমি কারও অসম্মান করতে চাই না; কারও মতকে অশ্রদ্ধা করতে চাই না। মনের যন্ত্রে ফেলে সবদেশের মতকে জানার আগ্রহে জানতে চাই, বুঝতে চাই।

কোনও বিষয়ে জানতে চাইলে সেই ব্যাপারে কার দৌরাত্ম্য কতটুকু, উদ্দেশ্য কি, খুঁজে বার করার চেষ্টা থাকে। সেখানে ঐসব বিষয়ের বিরুদ্ধে আমরা আলোচনা করছি, সমালোচনা করছি, একথা বললে সম্পূর্ণ ভুল করা হবে। কারণ এই **সমাজজীবনে বাস্তবক্ষেত্রে যে যা কিছু করে, দেখেশুনে বুঝেই সবকিছু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা বেচা, বিবাহের সম্বন্ধাদি যে যা কিছু করছে, যতটা পারে ভেবেচিন্তে, বুঝেশুনেই মানুষ করছে।** তাতে যে ভুলত্রুটি না হয়, তা নয়। তবুও যতটা বাস্তবজ্ঞানে করা দরকার, শতকরা ১০০ ভাগ (১০০%) মানুষ তাই করে যাচ্ছে। এটাই প্রকৃতির প্রকৃত নীতি, প্রকৃতির প্রকৃত ধারা। বনের জীবজন্তুরাও তাদের পরিবেশে বুঝেশুনে চলছে। তাদের আহার সংগ্রহ, আশ্রয়, আত্মরক্ষা সবকিছুই তারা বুঝে বুঝে করে।

আমরাও রাস্তাঘাটে চলাফেরা দেখেশুনেই করি। যেটা অজান্তে ভুল

হয়ে যায়, তার কথা আলাদা। জানার দিক থেকে বুঝবার দিক থেকে, ত্রুটি সহজে কেউ করে না। আমরা অনেক সময় আবার অন্যের উপর নির্ভরও করি। আরেকজনের জানার উপরে, বুঝার উপরে নির্ভর করেও চলতে হয়। তাতেও অনেক ভুলত্রুটির মাঝে পড়তে হয়। যেটা বললাম, এটা হ'ল এখানকার বাস্তবক্ষেত্রে বুঝের দিকটার কথা। তারপর হয় ধারণা। যারা ধারণা করে চলে, তারা একটা নিজস্ব বুঝ নিয়ে, চিন্তা নিয়ে চলে। কিন্তু ধারণাও আবার অনেক ধরণের আছে। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক যে ধারণা, সেটা হ'ল, এই ব্যক্তি এরকম করতে পারে বা এরকম হতে পারে। সেই ধারণা অনেকসময় সত্য হয়; অনেক সময় সত্য হয়ও না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা করে বা অন্যের উপর নির্ভর করে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সমীচীন নয়।

আমাদের আজকের সমাজে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ধারণার ওপরে কাজ করে চলেছে। ধারণার ওপরে কাজ করলে অনেকসময়ই হয় ভুল বুঝাবুঝি। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কাজকর্মে বহুক্ষেত্রেই মানুষ ধারণার বশে চলে। একজন আরেকজনের সম্পর্কে ধারণা করলো, 'ও' এটা করেছে, 'ও' এটা বলেছে, 'ও' চোখের ইশারা দিয়েছে, ইত্যাদি। আবার একজন হয়তো আরেকজনের সাথে কানে কানে কথা বলছে, তার নিজস্ব কথা। কিন্তু সেখানে উপস্থিত অপর ব্যক্তি মনে করলো, ধারণা করলো যে, তার বিপক্ষে তাকে নিয়ে আলোচনা করছে। এক কথায় ভুল বুঝলো। এটা বুদ্ধি ও বিচারের অভাব। **হাল্কা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝটাও হয় হালকা। তারা এইসব ভেবে মানুষকে ভুল বোঝে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ, কত কাণ্ডকীর্তি এই সংসারে হয়ে যাচ্ছে শুধু ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির বশে।** যাদের চিন্তার একটু গভীরতা আছে, তারা ধারণা করার আগে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেকেই কানকথায় বিশ্বাস করে ভুল ধারণা করে নেয়। বুঝুক না বুঝুক, কানকথায় (শোনাকথায়) কারও ওপরে ভুল বুঝে নিল। আগেই বলেছি, যাদের মনের গভীরতা আছে, তারা এটা করে না। তারা কারও সম্বন্ধে কানকথা শুনলো, সত্যমিথ্যা যাচাই করে জেনে নিল, ঠিক কি না। এটাই নিয়ম। যে কোন কথা যাচাই কর, জিজ্ঞাসা কর, বুঝে নেবার চেষ্টা কর। কানকথায় বা

ধারণার বশে যেন ভুল বুঝাবুঝি না আসে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। এতে সমাজজীবনের অশান্তি অনেকটা কমে যাবে।

আমার অভিজ্ঞতায় কয়েক লক্ষ ঘটনা আছে। কয়েক লক্ষ প্রেম ভালবাসার কাহিনী আমার কাছে এসেছে এবং দেখা গেছে, ভুল বুঝাবুঝির ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক সংসার ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ভুল বুঝাবুঝি, বাপ ছেলেতে ভুল বুঝাবুঝি, স্বামী-স্ত্রীতে ভুল বুঝাবুঝি অহোরহ চলছে। সাধারণ সাধারণ কথায় সাধারণ সাধারণ বিষয় নিয়ে একেকটা সংসার নষ্ট হয়ে গেছে। বহু কষ্টে আমাকে জোড়া দিতে হয়েছে। শুধু ভুল ধারণা আর ভুল বুঝাবুঝি, এটাই চলছে বেশী। তবে সব ধারণাই বেঠিক নয়। অনেক সত্যও আছে, অনেক ঠিকও আছে। ধারণা করে পাঁচটা ভুল হল, অথবা পাঁচটা ধারণা ঠিক হল, সেসবের দরকার নেই। এই ঠিকবেঠিকের কোন মূল্য নেই। ধারণায় বলা হল, 'সে খারাপ'। কিন্তু বুঝে পাওয়া গেল, তলিয়ে পাওয়া গেল, সে খারাপ নয়; সে ভাল। সুতরাং এগুলোর ওপরে নির্ভর করা উচিত নয়।

আমাদের এখানে কিছুদিন আগে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাটা কিছুই নয়। আমার এখানে আমার কাছে অনেকেই আসে। কেউ শুধু দর্শন করতে আসে। অনেকে আবার বহু সমস্যা নিয়ে আসে। দুজন ব্যক্তি কথোপকথন করছে, 'এই শালা এসেছে, উৎপাত করবে।' তাদেরই এক জ্ঞাতি ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কথাটা শুনে ফেলেছে। সে মনে করলো, 'তাকে শালা বলে গালি দিয়েছে, উৎপাত মনে করছে।' সে রাগ করে চলে যাচ্ছে।

অন্যেরা দৌড়ে গেছে, 'আপনি রাগ করছেন কেন? চলে যাচ্ছেন কেন? ঠাকুরকে দর্শন করবেন না?'

সেই ব্যক্তি বলে, 'রাগ করার মতো কারণ হয়েছে। তাই রাগ করেছি। নিজের কানে শুনেছি, আমাকে শালা বলছে। উৎপাত মনে করছে।'

তখন যে বলেছিল, সেই ব্যক্তি বলে, 'আপনাকে বলিনি'। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

— 'ঠিক আছে, আপনি ঠাকুরের কাছে চলুন। ঠাকুর যদি বলেন, তাহলে বিশ্বাস করবেন তো?'

— হ্যাঁ, করবো।

তারপর আমার কাছে নিয়ে এল। আমি বললাম, 'তোকে বলেনি। ওর নিজের শালাকে বলেছে।' তখন বিশ্বাস করলো।

এরকম সাধারণ ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হয়। একটু hints দিলাম। আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কত যে ভুল বুঝাবুঝি হয়, অন্ত নাই। এই ভুল বুঝাবুঝির মীমাংসায় অনেকে আসে। অনেকে কথাবার্ত্তার মাঝে জানতে চায়, সমাধান হয়। অনেকের সমাধান হয়ই না। যা ভুল বুঝলো, বুঝেই নিল।

এই কিছুদিন আগের একটা ঘটনা বলছি। তবে নামধাম বলবো না। তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে। সমাধান পরে আমি করে দিয়েছি। ছেলে অন্তরীণ (ইন্টারিন) অবস্থায় হাজতে আছে বছর দেড়েক। হঠাৎ একটা ফাংশনে যোগদান করার জন্য এক ঘণ্টার ছুটি পেল। বাড়ীতে এসেছে। স্ত্রীর সাথে একা ঘরে অল্প কিছুক্ষণ ছিল। কথোপকথন হয়েছে। তারপর চলে এসেছে। স্ত্রীর কন্‌সেপ্‌শন্ হয়েছে। পিরিয়ড অনুযায়ী বাচ্চা হবে। সে শুনতে পেয়েছে, স্ত্রীর কন্‌সেপ্‌শন্ হয়েছে। শুনে আশ্চর্য হয়েছে, 'কি করে হয়? কি করে হতে পারে?' তারপর সে রেগে টং। বৌ চিঠি দেয়, উত্তর দেয় না। বৌকে চিঠি লিখেছে, 'আমি হাজতে আছি। বাচ্চা কোত্থেকে এল?' তার মনের মধ্যে খট্‌কা লেগেছে। যথাসময়ে পুত্র সন্তান হল। দু'বছর পরে সে ছাড়া পেল। বাড়ীতে এসে বৌ-র সাথে কথা বলছে না। সেতো বৌ-র সাথে ঘর করবে না। বৌ ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী রেখে এসেছে। বৌ এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করছে।

আমি স্বামীকে ডাকালাম। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'তুমি এক ঘণ্টার জন্য বাড়ী এসেছিলে। স্ত্রীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য ছিলে। সেই ক্ষণিকের মিলনের ফলেই সন্তান এসেছে। এটা সম্ভব। এভাবে সন্তান আসতে পারে।'

সেতো ভুলেই গেছে। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করছে না। বলছে,

'এ অসম্ভব। হতেই পারে না।' আমি তাকে ভাল করে point out করে দিলাম। সেতো বিস্মরণের মধ্যেই রয়েছে। পরে স্বীকার করেছে, 'হতে পারে।' তারপরে আবার বৌ ছেলেকে নিয়ে যায়। নতুন করে ঘর সংসার করতে শুরু করে। ছোট একটা ঘটনা বললাম। এরকম অজস্র ঘটনা আছে। ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির ফলে যে পরিণতি হয়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

যাক্ যা বলছিলাম, এই পৃথিবীতে কত কোটি-কোটি মানুষ বাস করছে। এদের মধ্যে একেকজন একেক ভাব নিয়ে চলছে। বাইরের দিক থেকে অনেকে আদর্শ নিয়ে চলছে। আর ভিতরে যত অবিচার, কুকীর্তি, বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কত মানুষের ক্ষতি করছে, বলে শেষ করা যায় না। এদিকে আদর্শের ভড়ং ঠিক রেখে চলছে। **এই সমাজে প্রায় কেহই সম্পূর্ণ আদর্শ নিয়ে চলছে না; আদর্শ বজায় রেখে চলার প্রয়োজনবোধ করছে না। অনেকেরই অনেক দিক থেকে আদর্শগত অভাব রয়েছে। সামনাসামনি দু'চার কথা বললে এদের হাসি বা বিনয় দেখে আস্থা করলে চলবে না।** সম্পূর্ণ আস্থা করতে হলে ভিতর দেখতে হবে। সাধারণতঃ আমরা দেখি, আচার-নিষ্ঠা, বাইরের দিক থেকে। বাইরে থেকে দেখে, আমরা মোটামুটি ধারণা করি, সে আদৌ ভাল অথবা ভাল নয়। এমনও দেখা গেছে, ছেলের বৌকে কি করে খুন করে, আবার ছেলের বিয়ে ঠিক করে, আরেক জায়গা থেকে টাকা Collection (সংগ্রহ) করবে, সেই চিন্তায় ব্যস্ত। বাইরে স্যুটে বুটে অথবা তিলকে, নামাবলিতে অত্যন্ত ভদ্র; ভিতরে শয়তানের শিরোমণি। এরকম বহু আছে সমাজে। এগুলো যারা করছে, হামেশাই করে চলেছে। কেউ প্রতিকার করতে এগিয়ে আসছে না। শেষ বেলা কোর্ট কাছারি। ঐ কোর্ট কাছারি পর্যন্তই শেষ হচ্ছে। কিন্তু সমাধানটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। এই যে এত মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা-দ্বেষ, খুনখারাপি, ডাকাতি চারিদিকে চলছে, সেইসব ব্যক্তিরাই বাইরে কত নিরীহ, কি মধুর ব্যবহার। কে বুঝবে এরাই ভিতরে ভিতরে নানা কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ধরা মুস্কিল, বোঝা মুস্কিল। এরকম হামেশাই চলছে। এই ধরণের অনেক ব্যক্তি আমার কাছে আসছে।

আমার প্ল্যাটফর্ম সবার জন্য। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আমার কাছে

আসছে। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে নানাধরণের ঘটনা ঘটিয়েছে, সাজা হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসেছে। খোলাখুলি আমাকে বলেছে, 'বাবা, বহু ডাকাতি করেছি। বহু আঘাত দিয়েছি। জেল খেটে তোমার কাছে এসেছি।' বাইরে অত্যন্ত ভদ্র। দেখলে বুঝা যায় না। এদের পরিবর্ত্তন কোথায়? কোন পরিবর্ত্তন নেই। যারা প্রতিবাদ করেছিল, ধরিয়ে দিয়েছিল, সাক্ষী দিয়েছিল, তাদের বিপদ। এরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে জের নিতে শুরু করলো। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছিল, তাদের বিপদ শুরু হল। এই তো চলছে আজকের সমাজে। কোন স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না, যেথায় প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র কোথাও কোন নিরাপত্তা নাই; প্রতিকার নাই। প্রতিকার কি করে হবে? সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিরাপত্তার অভাবে এবং চারিদিকের অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্যের পেষণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ছে। যারা ভাল হতে চায়, তারা পর্যন্ত ভাল হতে পারছে না। আশার কিছু থাকলেও আশা নাই বলছে। এমতাবস্থায় মানুষকে ছল-চাতুরী ও মিথ্যায় টেনে নিচ্ছে। একজন ডাকাত রিভলবার দেখিয়ে বলছে, 'যা আছে দিতে হবে।'

—যার কিছু নাই, সে বলছে, 'আমার কিছু নাই। খাওয়া জোটে না।' যার আছে, মিথ্যা বলতে চায় না। কিন্তু মিথ্যা বলতে বাধ্য হচ্ছে অবস্থার চাপে। অনেকেই অফিসে চাকুরী করে। সেখানেও সত্য কথা বলতে পারছে না। মিথ্যা, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কারণ সত্য বললে চাকুরী থাকবে না। হাটে-বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে সত্য কথা বলছে না। **বিবাহের সম্বন্ধে, আত্মীয়তা স্থাপনে সর্বত্র মিথ্যার ঠোকাঠুকি চলছে। এমন একটা স্থান নেই, যেখানে ঝঞ্ঝাট নেই। একেবারে শ্মশানে যাওয়া অবধি ঝঞ্ঝাট চলেছে। শ্মশানেও কার মরা কোন্ চুল্লীতে দেবে, কার আগে কে pass করবে, সেই খেলা চলেছে।** সুযোগ সুবিধাগুলো কে কিভাবে গ্রহণ করবে, সেই চেষ্টা সেখানেও চলেছে।

শ্মশানে Dead-body-র (মৃতদেহের) শয্যাদ্রব্য, বিছানাপত্র খাট-পালঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে পাচার হয়ে যাচ্ছে। একজনের দাদু মারা গেছে। দুই বছর পরে বাবা মারা গেছে। বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য খাট কিনতে গেছে। খাট কিনে এনে দেখে দাদুকে দাহ করার জন্য যে খাট কিনেছিল,

সেই খাটই আবার কিনে এনেছে। দাদুর খাটে আনমনে একটা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছিল। সেই চিহ্ন দেখে চিনতে পেরেছে। ব্যবসা কিভাবে চলছে, তা আর বলার নাই। বিছানাপত্রের তুলা পাচার হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে আবার আমাদের কাছেই আসছে। অসুবিধা নাই। মরার খাটিয়া আসুক, আর যাই হোক, ব্যবসা যে যেভাবে করুক, চিন্তা করে লাভ নেই।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যা চলছে শুধু ভেজাল আর ভেজাল। কথায় ভেজাল, চালে (আচরণে) ভেজাল, ব্যবহারে ভেজাল। শুধু তেলে ঘিয়ে ভেজাল নয়। সর্বত্র সর্বজায়গায় দেখা যাচ্ছে শুধু ভেজাল। এখানে ক'জন যে ভাল, বলা যায় না। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি। কিভাবে বাস করছি, বলতে পারছি না। মিথ্যা ছল-চাতুরীর সঙ্গে লড়াই করে চলছি। তাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। আমরা সবাই একই পথের পথিক। রাস্তায় ঘাটে, অফিসে, ট্রামে বাসে ট্রেনে কিভাবে যে সবকিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ঠিকমতো সত্যভাবে যদি চলতো, শুধু ট্রেনের টাকায় ভারতবর্ষের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমাদের সব জায়গায় শুধু ক্ষতি, শুধু ঘাট্তি। ট্রেনে ঘাট্তি, বাসে ঘাট্তি, ট্রামে ঘাট্তি। এই ঘাট্তির সমাধান কেউ করতে পারলো না। ট্রেনের যে Income (আয়), যদি সদ্ভাবে থাকতো, সদ্ভাবে টাকা আসতো, তবে একজন বলেছিল, 'ট্রেনের লাইন সোনা দিয়ে বাঁধান যেত।' কথাটা অসত্য নয়। বাসের Income ঠিক থাকলে সব নতুন নতুন বাস দেখা যেত। আমরা ফাঁকি দেব, ফাঁকির ব্যবস্থা করবো, আবার গাড়ীতেও চাপবো, তাহলে তো হবে না। এরকম তো অগুণ্তি। বেশীরভাগ বিভাগে খুঁজে দেখবে, এরকম তছনছ নয়ছয় চলছে। কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। সমাধান কে করবে?

যাদের উপরে সমাধানের ভার, তারা দেখে এসে বলছে, 'সব ঠিক আছে। কোন গোলমাল নেই।' সব ঠিক থাকলে ট্রেনের লাইন সোনা দিয়ে বাঁধানো হল না কেন? বছর বছর ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে কেন? ঘাট্তি পূরণ হচ্ছে না কেন? সুতরাং সবকিছু এভাবেই চলছে। লাইনের ভার সেই হাতেই রয়েছে। সমাজজীবনের চাকা এভাবেই চলছে। কি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, বলে বোঝানো যায় না। যারা দোষ করতে

চায় না, তাদের জেল হাজত করতে হচ্ছে। ভারী চমৎকার। এই পরিস্থিতির খেলাতে দোষী নির্দোষ, আর নির্দোষ দোষী প্রমাণিত হচ্ছে। সমাধানের প্রচেষ্টা থাকলেও কোন সমাধান হচ্ছে না। সমাধান না হলে কোন কাজই হবে না। তাই কোন সুরাহাও হচ্ছে না। একজন বলেছিল, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা দরকার? সরকার বেকার ভাতা দিচ্ছে। বেকার ভাতা দিয়ে কি বেকার সমস্যার সমাধান হয়? বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে ব্যাপকভাবে কিছু করা দরকার। আজ সরকারের তরফ থেকে কোটি কোটি টাকার কাজ বার হচ্ছে। সেই কাজ তাদের ওপরেই ন্যস্ত হচ্ছে, যাদের কোটি কোটি টাকা আছে। যদি এমন করা হোত, পশ্চিমবঙ্গের ৫০ হাজার ছেলের মাধ্যমে এই কাজটা করা হোক, তাহলে তারা আপ্রাণ খেটে কাজটা করতো। তা করা হয় না। যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন, তারা কাজ পাচ্ছে না। যাদের প্রচুর টাকা আছে, তারাই কাজ পাচ্ছে, কাজের কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, নানাদিকে ব্যয় হচ্ছে। যতটা ব্যয় হচ্ছে, সেই অনুপাতে সেরকমভাবে কাজ দেখতে পাচ্ছি না। অন্যান্য দেশে জনগণের স্বার্থে কোন কাজ হলে সুযোগ-সুবিধাগুলি যেমন বোঝা যায়, আমরা তেমনভাবে বুঝতে পারি না। **অন্যান্য দেশে কাজের কন্ট্রাক্ট নেয় দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশের স্বার্থে। আর আমরা যা কিছু করি, নিজের স্বার্থে। দেশের স্বার্থে যদি কোটি টাকার কাজের ভার দেয়, আমরা চেষ্টা করবো, কতটা নিজের জন্য পকেটে তুলতে পারি। কত লক্ষ টাকা নিজের জন্য সরাতে পারি। রাস্তাঘাট তৈরীর ভার দিলে ভাল রাস্তাঘাট তৈরী হবে না। কারণ আমাদের দেশাত্মবোধ নেই।** ব্রিটিশরা, আমেরিকানরা যদি কোন কাজ করে, তারা নিজের দেশের লাভের অঙ্ক দেখে। নিজেদের লাভের অঙ্ক দেখে না। কিন্তু আমরা দেশের স্বার্থের দিকটা দেখি না। নিজেদের লাভের দিকটা দেখি। মুখে মুখে বলতে পারি, বড় বড় কথা।

আগেই বলেছি, শুধু মুখের কথা বলে লাভ নেই। আমরা দেশের দিকে তাকাই না। তাই রাস্তাঘাট ঠিকমত মেরামত হচ্ছে না। কোন কাজই সুষ্ঠভাবে করতে পারছি না। কি করে হবে? হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র এক অবস্থা। কথায় কথায় কিছু বাড়তি কথা বলে ফেললাম। বলতে চাইনি।

রাস্তাঘাট, মাঠের চারিদিকে তাকিয়ে এমন দুঃখ হয়, **আমরা স্বাধীন দেশে বাস করছি কি না, বুঝি না। এর কারণ আছে। বহু বছরের পরাধীনতার চাপে ছিল আমাদের দেশ। এত অল্প সময়ে সেই গ্লানি কি ভুলতে পারে? তাই মনে হয়, পরাধীনতার প্রভাব রয়ে গেছে আমাদের ওপর। একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ থাকা উচিত, আমাদের মধ্যে তা নেই।** রাশিয়া, আমেরিকা, চায়না, ব্রিটেন— এইসব দেশের জনগণ দেশগত প্রাণ। আমরা দেশগত প্রাণ হতে পারিনি। বিশেষ বিশেষ দিনে Flag টানাই (পতাকা উত্তোলন করি), গভর্ণর স্যালুট নেয়, আর কুচকাওয়াজ হয়, তখন বুঝি স্বাধীনতা। সারা বছরের অন্য সময়ে আর বুঝি না। আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ থাকলে দেশে সাম্য, শান্তি, মৈত্রী আসতো। এখনও মানুষ পুলিশ দেখলে ভয় পায়। পুলিশকে বন্ধু মনে করতে পারে না। পুলিশ সম্বন্ধে এই কথাটা ভাবছে কেন? কেন ভাববে? কারণ পুলিশের কাছ থেকে বন্ধুর মত ব্যবহার পায় না। এমন ব্যবহার পায়, যাতে বন্ধু ভাবতে পারে না। পুলিশও আমাদের কাছ থেকে বন্ধুর মত ব্যবহার পায় না। সর্বত্রই চলছে এই অবস্থা। প্রায় সমস্ত বিভাগেই কারও সাথে কারও সহযোগিতা নেই। কে কেমন করে নিজেরটা গুছিয়ে নেবে, কার ওপরে কে টেক্কা দেবে, শুধু সেই চেষ্টা। এর কি কোন সমাধান হবে না? জনগণ কি সব কবরে চলে গেছে? এদের মাথায় যদি ভালভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই এরা সচেতন হবে। কথায় কথায় যা বললাম, এই পরিপ্রেক্ষিতে যা বলতে চাইছি, অল্প অল্প শোনানো হল। যা বললাম, ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। আরও ৯৯ ভাগ বলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এরপর এল মঠ মন্দির আশ্রমের কথা। সেখানে গুরুরা বসে আছেন ভদ্রবেশে। এই মঠ, মন্দির, আশ্রম, বিগ্রহ নিয়ে বেশীরভাগ সাধু-সন্ন্যাসীদের মাঝে আরেক খেলা চলেছে। আমরা জনগণ এদের কাছে গিয়ে আবার পড়েছি। আগেই বলেছি, ধারণায় চলা উচিত নয়। ভারতবর্ষে এত সাধু সন্ন্যাসী, একজনও বলতে পারছে না, 'ভগবান দর্শন করেছি বা ভগবান দর্শন করিয়ে দিতে পারি।' যত কথা সব ভাবের কথা আর উচ্ছ্বাসের কথা। ভক্তরা সব চলেছে সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে। তারা ভাবছে, ভগবান

নিশ্চয়ই আছেন। তাঁর দর্শন হয়। ধারণায় যারা চলে, তার মূল্য শূন্য। এরকম যে ধর্ম; **আমাদের দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম চলেছে গল্প, কল্পনা, ভাব আর উচ্ছ্বাসের উপর। কিন্তু আসল ধর্ম, প্রকৃত ধর্ম তা নয়। ধর্ম গল্প নয়, কল্পনা নয়, ভাব নয়, উচ্ছ্বাস নয়। ধর্ম সম্পূর্ণ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত।** আসল ধর্মের আচরণ, নিষ্ঠা খুব সুন্দর।

এখানকার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মের কোন প্রমাণ নাই; প্রমাণের ইঙ্গিত নাই। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মে ভগবানের কোন অস্তিত্ব নাই। কোন কিছুই নাই। কল্পনায় আর ধারণায় ধর্মের যে কথা, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। ধর্মের নামে কতগুলি গ্রন্থ আছে। সেইসব গ্রন্থের কথা শুনিয়ে এ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে যেন মানুষকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ্যানাস্থেসিয়ার মত কথা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছে। বেশীরভাগ মঠে মন্দিরে জাঁকজমকের পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছে। এমনিতে মানুষের অপরাধের শেষ নাই। তারা ভাবছে, যদি কিছু খালাস হয়। এই আশায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই ধারণায় মানুষ ছুটে আসছে। আগেই বলেছি, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির ধারণার বশে চলা উচিত নয়। ধারণা আসতে পারে। কিন্তু তাকে যাচাই করে নিতে হবে, প্রমাণ করে নিতে হবে। এখানকার অধিকাংশ মঠ মন্দিরগুলিতে ধর্মের নামে দেবদেবতা, বিগ্রহের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, যাচাই নাই। শুধু সাধু সন্ন্যাসী, মোহান্ত আর বাবাজীদের একচ্ছত্র আধিপত্য; শুধু এই বিতরণ, সেই বিতরণ; এই দান, সেই দান। সব পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেদের আখের গুছানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ভড়ং-এর অন্ত নাই। ভড়ং করুক, মাথা মুণ্ডন করুক, গেরুয়া পরুক, আরও কিছু করুক। জনগণকে বিভ্রান্ত করছে কেন? মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে ধর্মের নামে জনগণকে দোহন করার মতো অপরাধ আর কিছু নেই। নানা দল, সম্প্রদায়, মঠ, মন্দির চারিদিকে যেন কারখানার মত বসে গেছে। শুধু বিগ্রহের নামে 'এই দাও, সেই দাও'। এইভাবে ভগবানের দোহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছে। দর্শনে টাকা, পূজোয় টাকা, প্রণামীতে টাকা, দানধ্যানে টাকা; যারা দিচ্ছে তারা মনে করছে, 'পরকালের কাজ করলাম।' আর যারা নিচ্ছে তারা মনে করছে, বিরাট মট্‌কীটা (সিন্ধুকের মত বিরাট জালা)

ভরছি। এইভাবে চারিদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। কতজন মঠে মন্দিরে কত সোনার জিনিস দিয়ে দিচ্ছে। কেউ হয়তো কোন কাজ করার আগে দেবতার কাছে মনস্কামনা করেছে কার্যসিদ্ধির জন্য। কাজটা ভালভাবে হয়ে গেছে। তখন সে মনে করছে, 'দেবতার কাছে মানস করেছি, তাই কাজটা হ'ল'। সে খুশীমনে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে আসলো। হঠাৎ করে কোন ইচ্ছা পূর্ণ হলে, কোন কাজ সফল হলে, সেটা plus+ হয়েছে, সঠিক হয়েছে মনে করলেও সেটা সঠিক নয়। কারণ সঠিক যেটা, প্রামাণ্য যেটা, সেটা সর্বাবস্থায় একইরকম থাকবে।

দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, মঠে মন্দিরে মানস করে কারও ছেলে বাঁচছে। আবার অনেকের ছেলে ভাল হচ্ছে না। কেউ বিপদে পড়ে জেল হাজত খাটছে। দেবতার দুয়ারে ধর্না দিয়ে কেউ খালাস হয়ে যাচ্ছে; কেউ হচ্ছে না। **প্রকৃত ধর্ম বলছে, বাস্তবের কথা। যেটা হবে, সবার হবে। কারও হবে, কারও হবে না— প্রকৃতিতে এরকম বৈষম্য থাকতে পারে না।** যাদের মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে, তারা এসে নানা পূজার সামগ্রী, অর্থ দেবতার পায়ে নিবেদন করছে। এই যে দেওয়ার হিড়িক চলছে; তাতে বেশীরভাগ মঠে মন্দিরে চাল, ডাল, ভোগ্য সামগ্রী, অর্থ সম্পদ কিভাবে বাড়াবে, তার প্রচেষ্টাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বেশী। চারিদিকে এটাই যেন চলছে। অন্য কিছু দিতে পারছে না। তারা পূজার আয়োজন করছে সুন্দর। ঘণ্টা বাজাচ্ছে সুন্দর। আরতি করছে সুন্দর। যারা যাচ্ছে, পরিবেশ দেখে, আয়োজন দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমার কথা হ'ল, এতসব পূজা করে, আরতি করে কি লাভ হয়েছে? কিছুই না। শুধু বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাদের base কি? দেবদেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি প্রমাণ দিতে পারে, তবে সবই সত্য হয়ে যায়। কোন সাধু সন্ন্যাসী কেউ প্রমাণ দিতে পারছে না। কোন বস্তুর প্রমাণ আলাদা, গণিত আলাদা। তারা কোন প্রমাণে বা গণিতে যাবে না। শুধু গল্প আর ভাসয়মান কথা। চোখ বুঁজে বুঁজে শুধু কথার জাগ্‌লারি। এতে সমাজের কোন সুব্যবস্থা, কোন পরিবর্ত্তন আসছে না। সমাজের কল্যাণের পথে তাদের কোন অবদান পাচ্ছি না। বেশীরভাগ সাধু সন্ন্যাসীরা মঠে মন্দিরে নিজের নিজের দল, সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে, স্বার্থ

বাড়াচ্ছে, এটাই দেখতে পাচ্ছি। কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে সত্য যদি থাকতো, সেই সত্যের ঢেউ এসে সমাজকে সুন্দর পরিবর্ত্তনের পথে নিয়ে যেত। ৫০ বছর আগে দেশে এত দুর্নীতি ছিল না। ৫০ বছর পরে আরও জটিলতার পথে, চরম কুৎসিতের পথে সমাজ চলে গেছে। এদের দ্বারা যদি কোন উপকারই না হ'ল, শুধু পাণ্ডিত্যের কথা আর বাগ্যবাগীশের উপদেশে কি হবে? এমতাবস্থায় এদের দ্বারা কিছু হচ্ছে না। শুধু বড় বড় কথা বলছে। কিন্তু কোনটাই কার্যে পরিণত করতে পারছে না। মঠে মন্দিরে যতসব সাধুসন্ন্যাসীরা আছে, তারা নিজেরাই সন্ধান পায়নি। যদি তারা নিজেরা দেবদেবতার, ভগবানের সন্ধান পেত, তবে অন্য সবাইকেই সেই সন্ধান দিতে পারতো। **সৃষ্টির মাঝে কোন কিছুই কোন জটিলতায় বা গোপনে থাকে না। সৃষ্টির নিয়ম হ'ল, যে যা আবিষ্কার করবে, সবাই তার সুফল ভোগ করবে। মঠে মন্দিরে বেশীরভাগ সাধু সন্ন্যাসীরা কাউকে সত্যের সন্ধান দিতে পারছে না। তারা শুধু বুলি দিয়ে আর চমক দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছে।**

আমি কাউকে চটাতে চাই না। তারা যদি ন্যায়নীতিতে থাকে, সত্যের সন্ধান দিক। এরা দেবদেবতার বিগ্রহের সামনে বসে থাকবে; আর ভাগ্য, কর্মফল, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, ভুলিয়ে রাখবে, কোন সত্যিকারের কাজ করবে না, এটা ঠিক নয়। বেশীরভাগই ধারণা, কল্পনা, গল্প আর ভাব-উচ্ছ্বাসে মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। যে ধর্ম সত্য, সবদেশের মানুষ সেই ধর্ম গ্রহণ করবে। আজ কোনদেশের ধর্ম অন্য কোন দেশ গ্রহণ করতে পারছে না। যত কাওলাতি নামানামিতে; যেমন, হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম আরও কত ধর্ম। কিন্তু ধর্মের আসল তত্ত্ব কিছুই পাওয়া যায় না এইসব খণ্ড খণ্ড ধর্মে। দেবদেবতার দর্শনের জন্য, ভগবানকে পাবার জন্য কত মানুষ কত পরিশ্রম করেছে। কিন্তু পরিশ্রমের সুফল তারা পায়নি। ধর্ম সম্বন্ধে, মঠ মন্দির সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কথা হল।

আমরা মঠে মন্দিরে দেবদেবতাদের গ্রহণ করতে চাই, তাদের শ্রদ্ধা করতে চাই। মঠে মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীদের সমস্ত মতামত শ্রদ্ধাসহকারে মানবো, কিন্তু দেবদেবতাদের সত্তা সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করে দিতে হবে। শুধু সিংহাসনে মূর্ত্তি বসিয়ে রাখলে চলবে না। মানুষের সেন্টিমেন্টে ঘা

দিয়ে অর্থোপার্জন করার পথ পরিষ্কার করলে চলবে না। তাদের কার্যকলাপে ব্যবহারে আমরা তাদের মাথায় রাখতে পারছি না। যদি তাদের ব্যবহারে তাদের মতামতকে মাথায় রাখতে না পারি, তাহলে করবো মোকাবিলা। তাদের ধরে ধরে নামিয়ে দেওয়া হবে গদী থেকে। তারা মাঠে গিয়ে চাষবাস করুক। **দেবদেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য প্রমাণিত না হলে মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষকে, সহজ সরল জনগণকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে পারবে না।**

এই কথাগুলো যা বললাম, সামান্য কিছু কথা। ১০০ ভাগের ১ ভাগও বলা হ'ল না। খুলে খুলে যখন বলবো, তখন দেখবে কঙ্কালমাত্র সার। X-ray-তে (এক্সরেতে) কঙ্কাল ওঠে না? এই জগতের রূপ কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়। সব প্রেতের মত চেহারা, কঙ্কালের চেহারা দেখতে পাবে। তখন বুঝতে পারবে, এরা কি করতে চায়। তারা বলুক, 'আমরা এই করতে চাই।' আমরা পরিষ্কার জানতে চাই। আমরা জানবো। **চারিদিকে শুধু অপরাধের পর অপরাধ, অন্যায়ের পর অন্যায়ের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। প্রতিকারের চিৎকার আছে, কিন্তু প্রতিকার নাই।**

ভারতের সন্তানরা, বিবেকবান ব্যক্তিরা যদি এইসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়, সমাধানকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য। এটাই চেষ্টা করছি। তোমরা শুধু এটুকু মনে রেখ। প্রত্যেক মা বাবাই চায়, তার সন্তান ভাল থাকুক, সুখে থাকুক। এটাই সাধারণ ধর্ম। বর্ত্তমানে সমাজের বেশীরভাগ স্তরেই অধিকাংশ মানুষ অন্যায় অপরাধে লিপ্ত। আমরা অন্যায়ের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। দেশে শান্তি হোক; সবাই খেয়ে পরে বাঁচুক; এটা আমরা সবাই চাইবো।

মনে রেখো, মানুষ চায় ভালভাবে বাঁচতে। বাবা নিজে চোর, ডাকাত হলেও সে চায় ছেলে বাধ্য হোক। ছেলে ভুলপথে যাক, বিপথে যাক, কোন বাপই চায় না। ডাকাত বাবা হয়তো কত পরিশ্রম করছে, ছেলেকে ভাল করার জন্য। মাষ্টার রেখে দিয়েছে, শাসন করছে, যাতে সে পড়াশুনা করে মানুষ হতে পারে; সদ্‌ভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আমরা আজ নির্যাতনে রয়েছি, সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছনা পাচ্ছি। দেশে শান্তি হোক, সবাই খেয়ে পরে বাঁচুক, একথা কি জোর করে বলতে পারবো না?

সমাজের সেই বঞ্চিত অবহেলিত অপরাধীরা, যাদের আমরা মস্তান বলি, সমাজবিরোধী বলি, তারা কি একথা বলবে না? বিপদের সময় তাদের চেতনা ঠিক ফিরে আসবে। তখন তারা সমাজের অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কার্পণ্য করবে না। পাড়ার মস্তানরা ডাকাত পড়লে, সেই বিপদে কি পাড়াকে রক্ষা করে না? সময়কালীন আপদে বিপদে পাড়া রক্ষাকল্পে তারাই এগিয়ে আসে। আমরা যে পর্যায়েই থাকি না কেন, সমাজের দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো করবোই; তার ব্যবস্থাও করবো। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে হবে কার্যসূচী। এইসকল কার্যধারার ইঙ্গিতমাত্র দিলাম। আবার বলছি, ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র বললাম।

যে প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করেছিলাম, যা বলতে চেয়েছিলাম, ঘরোয়ানা আলাপ আলোচনায় প্রসঙ্গ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেলাম। অন্য দিকে mind diverted হয়ে গেল। ভিন্নলোকের কথাবার্তাতে কথা বলতে হল। সেই কথাটি আরেকদিন ঘরোয়ানা ক্লাসে বলবো। কথাগুলো একটু ভাঙা ভাঙা খণ্ড খণ্ড লাগতে পারে।

ভক্ত— আজ্ঞে, না। খণ্ড খণ্ড জানলেও কোন অসুবিধা নেই। যতটুকু পেয়েছি, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যেদিন কৃপা করে বলবেন, পুরোপুরিটা শুনবো।

ঠাকুর— আমার তো একটানা বলার ইচ্ছা ছিল। প্রসঙ্গ হারিয়ে অন্যদিকে যেতে হয়। যা বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারলাম না।

ভক্ত— আজ্ঞে, আমরা খুব খুশী হয়েছি, ভরপুর হয়েছি। আবার যেদিন শুনবো, পরিপূর্ণ হবো। যা শুনেছি, তাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ঠাকুর— যেটুকু শুনলে, মনে রাখার চেষ্টা করো। ঘরোয়ানা পরিবেশে একান্তভাবে কয়েকটি কথামাত্র বললাম। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

ভক্তগণ— (সকলে) রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বস্তু ও বাস্তব ছাড়া প্রশ্ন যদি কেহ করে, সেই সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তব

সুখচরধাম
১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৫

তর্ক করতে শিখেছ। তর্ক করে যাচ্ছ। কেন তর্ক করছো বলতো? কেন প্রশ্ন তুলছো? প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা পেয়েছ কি? প্রশ্ন করা যায়, যে পর্যন্ত প্রশ্নের সীমানা খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই প্রশ্ন করছে যারা আর উত্তর দেবে যারা, উভয়ে তো একই পর্যায়ের। কতগুলো প্রশ্ন আছে বাস্তবভিত্তিক। যেমন, কোন বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে হ'ল? কিভাবে হল? কি তার কাজ? কোথা হতে উদ্ভব? ইত্যাদি। সব প্রশ্নই যদি বস্তুবাদের উপরে থাকে, জানা থাকলে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার পক্ষে অনেকটাই সম্ভব হয়।

কতগুলো প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্ন যারা করছে, তারা জানে না, এই প্রশ্ন করা উচিত কি না। আবার জানে বলে যারা উত্তর দেবে, তারাও সেই প্রশ্নের উত্তরের অধিকারী হয়ে উত্তর দিচ্ছে কি না, সেটাও সন্দেহজনক। কারণ **বস্তু বা বাস্তব ছাড়া প্রশ্ন যদি কেহ করে, সেইসব প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাদের প্রশ্নগুলো, সেইসব অবাস্তব কাহিনীগুলো অবলম্বন করে চলতে থাকে। বাস্তবের কোন কথাই ঐসব প্রশ্নের মধ্যে নেই। কারণ কাহিনীগুলো সম্পূর্ণ কল্পনাভিত্তিক এবং কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।**

আজকালই শুধু নয়, অনেক আগেও এক ধরণের ব্যক্তি ছিল, যারা জানবার আগ্রহে প্রশ্ন করে না। অন্যকে জব্দ করবার জন্যই কতগুলো প্রশ্নের উদ্ভব করে থাকে। এই প্রশ্নগুলি করার উদ্দেশ্য যেন আল্‌গা একটা বাহাদুরি নেওয়া। কেউ সঠিক উত্তর বললেও এইসব

অবাস্তব চিন্তাধারার মানুষগুলো মানতে চায় না, বুঝতে চায় না; তর্ক চালিয়ে যেতে চায়। এটা হল বিচক্ষণতার অভাব, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব অথবা কোন দল, সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ। রাজনীতি বা অন্যনীতি, সব নীতিতেই এই ধরণের ব্যক্তি আছে।

মনে কর, হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলো, 'আপনি ভগবান দেখেছেন?'

এই ধরণের প্রশ্ন করার কি মানে আছে? যাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

প্রঃ — আমাকে দেখাতে পারেন?

উঃ — সম্ভব নয়।

প্রঃ — কি করে বুঝবো, আপনি দেখেছেন?

উঃ — চিনি খেয়ে স্বাদে উপলব্ধি করেছি।

প্রঃ — স্বাদটা কি বুঝাতে পারেন?

উঃ — চিনির স্বাদ যদি কেউ বুঝাতে পারে, তাহলে আমিও আপনাকে ভগবান বুঝাতে পারবো।

এখন বল, চিনির স্বাদ কি কেউ বুঝাতে পারে? চিনির স্বাদ বুঝাতে গেলে বলবে, 'অতি মিষ্ট, অতি চমৎকার।' তাতে কি স্বাদ বুঝানো গেল? নিশ্চয়ই নয়।

সুতরাং ভগবান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে যারা বলবেন, 'দেখেছি,' তারা এভাবে রেহাই পেয়ে গেলেন। **বাস্তবের দিক থেকে মুখে মুখে কোনদিনই স্বাদ বুঝানো যাবে না। আবার স্বাদ বুঝানো যাবে না, একথা বললে তো হবে না। একটু চিনি নিয়ে মুখে দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।** একটু চিনি অপর ব্যক্তির মুখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন লাগলো?'

সে আবার বললো, 'ভারী চমৎকার।' সে স্বাদ বুঝে নিল। আর তাকে বুঝাতে হবে না।

ভগবানের বটিকা এমন কিছু যদি থাকতো, আর সেটা কানে মাথায় মুখে ঢুকিয়ে দিতে যদি পারতো, তবে বুঝতো, 'ভগবান কি।' কিন্তু ভগবানকে বুঝবার এমন কোন বটিকাতো নাই। কোনটা দিয়েই 'ভগবান আছেন,' 'ভগবান দেখেছি' এই ব্যাপারে কোন প্রমাণ দিতে পারে না।

এমতাবস্থায় যিনি প্রশ্ন করলেন, আর যিনি উত্তর দিলেন, তাদের সম্বন্ধেই বা কি বুঝা গেল? সমাধান কিন্তু হল না। আবার কেহ কেহ এমন সব ছোট ছোট ক্ষমতার পরিচয় দেয়, যা দিয়ে প্রমাণ করে, ভগবৎ শক্তি না থাকলে, ঐ ক্ষমতাগুলো প্রকাশিত হয় না। **আতসকাঁচের মাধ্যমে সূর্যরশ্মিকে concentrate করলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়। এটা বাস্তবসত্য। কারণ যে কেউ আতসকাঁচ হাতে নেবে, সূর্যরশ্মিকে concentrate করে সেই আগুন জ্বালাতে পারবে। এর মধ্যে কপাল বা ভাগ্য, এগুলোর কোন বালাই নেই।** শুধু আতসকাঁচের মাধ্যমে সূর্যের তেজকে, সূর্যের দাহিকা শক্তিকে বুঝতে হবে কেন? খালি গায়ে পিঠটা যদি প্রখর সূর্যকিরণে রাখে, তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে, এরচেয়ে বেশী সূর্যের তেজকে একত্রিত করলে আগুন ধরানোর পক্ষে কোন অসুবিধা নেই।

একটা লোককে একজন রোগমুক্ত করলো ক্ষমতা বলে। দেবতা বা ভগবানের শক্তির সাহায্যে কাজটা করেছে, বলে বলছে। দেবতা বা ভগবানকে এখানে টেনে এনে লাভ কি? মানুষ নিজ শক্তিবলে অপর মানুষকে রোগমুক্ত করতে পারে কি না, বাস্তবে এটা প্রমাণিত হয় কি না, সেটাও দেখা উচিত। ধর, একজন রোগীকে একজন চিকিৎসক ভাল করলো। যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে লোকটিকে ভাল করা হ'ল, তারমধ্যে কি কোন মনঃসংযোগ নেই, মননশক্তি নেই? প্রথমে সেই রোগের জীবানু নিয়ে রিসার্চ শুরু হ'ল। তারপর রিসার্চ করে করে কিভাবে সেই রোগের জীবানুগুলিকে ধ্বংস করা যেতে পারে, তার প্রচেষ্টা শুরু হ'ল। দীর্ঘকাল গবেষণা করে ঔষধ নাম দিয়ে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হল। বিভিন্ন জীব জন্তুর দেহে সেই ঔষধ প্রয়োগ করে সত্যসত্যই রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারছে কি না, পরীক্ষা করা হ'ল। পরীক্ষায় সফল হলে তবে

সেটা মানব দেহে প্রয়োগ করে মানুষকে রোগমুক্ত করতে পারলো। এইভাবে এক একটি ঔষধ আবিষ্কারের পিছনে দীর্ঘকাল ধরে কত অধ্যবসায়, কত পরিশ্রম করতে হয়। এটাও তো এক ধরনের ক্ষমতা। এক একটি ঔষধ ব্যবহার করে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা হচ্ছে; মৃত্যুর মুখ হতে ফিরে আসছে। যিনি ঔষধ আবিষ্কার করলেন, সেটা অন্যরা জেনে নিয়ে ঔষধ তৈরী করতে লাগলো। এইভাবে চিকিৎসকরা জেনে নিয়ে রোগের প্রতিকার করতে আরম্ভ করলো। যারা যোগী, তারা সাধনা করে ক্ষমতার প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতি, এই চিকিৎসকের কাজ, এটা কি যৌগিক কাজ নয়? ঔষধ আবিষ্কার করে মানুষকে রোগমুক্ত করার জন্য তারা কি সাধনা করেন না? দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তারা মানুষকে রক্ষা করছেন না? সব কিছু যোগাযোগের মাধ্যমেই তো হয়ে যাচ্ছে। ঠিক কি না।

বাস্তবে কত কত ব্যাপারে তারা মনোযোগ দিয়েছে। চিকিৎসা ব্যাপারে, সুস্থ করার ব্যাপারে, জীবানু বিনাশকল্পে, Symptoms দেখে রোগনির্ণয়ের (Diagnosis) ব্যাপারে গভীর মনঃসংযোগ করতে হয়েছে। সবকিছু থেকে তারা একটা সুরাহার পথ বার করবার চেষ্টা করেছে। তাতে কি তারা সফল হয়নি? এখানে ভগবান বা দেবতার ব্যাপার তো কিছু নেই। বাস্তব বিষয়বস্তু নাড়াচাড়া করেই, এই বাস্তব বিষয়বস্তু থেকেই তারা খুঁজে পেয়েছে সবকিছু। এটা না হয় বস্তু থেকেই ঔষধ আবিষ্কার করে রোগমুক্ত করলো।

আরেক ধরণের ব্যক্তি আছে, যারা দেহের মাধ্যমে মনঃসংযোগ করে অনেক রোগ, ব্যথা-বেদনা সারিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারা রোগীর মনোবল কিভাবে বাড়ানো যায়, তার চেষ্টা করতে থাকে। তারা যদি কোন রোগীকে রোগমুক্ত করতে চায়, এমন একটি প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার সাহায্যে মনোবল বেড়ে গিয়ে রোগীকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করে। এখানেই আসে দ্বন্দ্ব। কি করে রোগমুক্ত করলো?

সাধারণতঃ প্রত্যেকের দেহে ৯৭°/৯৮° ডিগ্রী টেম্পারেচার থাকে।

কারও দেহে যদি ১০৪°/১০৫° ডিগ্রী উত্তাপ ওঠে, জ্বর হয়, সে যদি অন্য কারও দেহে হাত দেয়, মনে হবে যেন জ্বরে হাতটা পুড়ে যাচ্ছে। তারচেয়েও যদি তাপ বাড়ে, আর সেই তাপ নিয়ে কারও গায়ে হাত দিলে, তার আরও বেশী লাগবে। আবার অনেক সময় রোগীকে যে current দেওয়া হয়, Electric Shock দেওয়া হয়, তাতে body-র ভিতরে current pass করে। গভীর মনঃসংযোগের দ্বারা, গভীর অভ্যাসের দ্বারা এমন একটি মনোবলের current সৃষ্টি করলো, সেটা প্রয়োগ করলো আরেকটি ব্যাধির উপরে। সবটাই প্রচেষ্টায় সম্ভব হল। তার স্পর্শে **Psychological Treatment-এ সেই রোগী অনেকটা রোগমুক্ত যে না হয়, তা নয়। এখানে কোনটাতেই অবাস্তবের ব্যাপার আসছে না। সবটাই বাস্তবভিত্তিক। এই সমস্তকে যদি যোগ বলা হয়, তবে এই যোগের প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে মানুষের ভিতরে এল?**

তার আগে আরেকটি কথা জেনে রাখা ভাল। এই পৃথিবীতে এই জীবজগতে যত জীবজন্তু আছে, উৎস কিন্তু সবার এক। এক হতেই সবার সৃষ্টি। তাই সবাই সবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সেখানে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। জীবের যত ক্ষমতা, প্রত্যেকে সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। নানা ধরণের অদ্ভুত অদ্ভুত জীব আছে। তাদের অনেক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাগুলো মানুষ যদি আয়ত্ত করতে পারে, তখন মানুষ হয় দেবতা। আর জীবের মধ্যে যখন সেটা প্রকাশিত হয়, সে কিন্তু দেবতা হলো না। সে ক্ষমতাটুকুনু সহজাতভাবে প্রকাশ করলো। মাছি দূর থেকে গন্ধ পায়। কয়েক মাইল দূর থেকে আম কাটলে বা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি টের পেয়ে গেল। টের পেল না কে? মানুষ টের পেল না। **মানুষ যদি যে কোন জীবের ক্ষমতাকে অর্জন করতে চায়, তাতে যদি সক্ষম হয়, তবে সেই মানুষ যেকোন জীবের ক্ষমতাকে অর্জন করতে পারে। তখন সেই মানুষ হয় মহাপুরুষ বা দেবতা।**

ঘরের কোন্ কোণে বাতাসা মানুষ বার করতে পারলো না। বার করলো কে? টিকটিকি, আরশোলা আর পিঁপড়া। ওরা কিন্তু আমাদের কাছে কোন দেবতা বনলো না, মহাপুরুষ হলো না, যোগীও হল না। তুমি যদি বার করতে পার, ঘরের কোন্ কোণে বাতাসা আছে, তুমি হলে

মহাপুরুষ। প্রকৃতির নিয়ম হলো, তুমি যদি দু'হাত দূরের গন্ধ পাও, অভ্যাসের মাধ্যমে চর্চা যদি কর, যোগ কর, তুমি কিন্তু ১০০ হাত দূরের গন্ধ পেতে পার।

আগেই বলেছি, একটা আম কাটলে, কত মাইল দূর থেকে গন্ধ পেয়ে মাছি আসে, বলা মুস্কিল। মাছি তো এল। কয়েক মাইল দূরের আমের গন্ধ সে পেল। সেই ঘ্রাণের ক্ষমতা, তোমার নাসিকায় (নাকে) আনতে পার। সেই আম কাঁঠালের গন্ধ তুমিও পেতে পার। তুমি যখন পারবে, তুমি হয়ে গেলে অবতার বা মহাপুরুষ। কিন্তু মাছি আর অবতার হতে পারলো না। এইভাবে আমরা চেষ্টা করিনি বলে পারিনি। একটি শিশুর সব ভাষা শিখে নেবার ক্ষমতা থাকে। একটি শিশুকে যে ভাষার পরিবেশে রাখবে, সেই ভাষাই সে দখল করবে। চীনাভাষায় কথা বলছে বলে, তাকে চাইনিজ বলতে পারবে না। ইংরেজী ভাষা দখল করেছে বলে, তাকে ইংরেজ বলতে পারবে না। কিন্তু শিখে তো নিল। সেই শিশু যত সহজে শিখলো, তোমাদের পক্ষে কিন্তু তত সহজে শেখা সম্ভব হয়ে উঠবে না। অন্য যে কোন ভাষা তোমাদের শিখতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। এখানে যত প্রশ্নই কর না কেন, যত তর্কই কর না কেন, শিখে তো নিল। তোমার বাচ্চা শিশু চাইনিজ ভাষা শিখলো। শিশুকে কি করে জিজ্ঞাসা করলে সে কি উত্তর দিতে পারবে? **জন্ম নিল বাংলাদেশে আর শিখে নিল চাইনিজ ভাষা? কি করে শিখলো? উত্তর দিতে পারবে কি? এটা যদি সম্ভব হয়, তবে একটা শিশু রাশিয়া, জার্মানী, আফ্রিকা— সব দেশের ভাষা শিখতে পারবে।** সব দেশের ভাষা শিখে নেবার যে পাত্র, সেই পাত্রের অধিকার নিয়ে তার জন্ম। শুধু শিশু নয়, সমস্ত পৃথিবীতে যত জীব আছে, সব জীবের সব অধিকার নিয়ে সবার জন্ম। আমরা ঠেকছি কোথায়? অত দেশের ভাষা শিখতে আমরা চেষ্টা করি না, চর্চা করি না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সহ্য এবং ধৈর্যের পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে

সুখচরধাম
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭

আসাম, নর্থবেঙ্গল ও অন্যান্য জায়গা থেকে তোমরা এসেছ বাবার কথা শুনতে। বাবা তোমাদের যেভাবে বলবেন, তোমরা সেইভাবেই চলবে। তোমরা এখন শুধু দেখে যাবে। কোথাও বেশী প্রতিবাদ করতে যেও না। তোমাদের কাজ উদ্ধার করার জন্য তোমরা সব জায়গায় যাবে। প্রচার করবে। জায়গায় জায়গায় বাধা আসবে। একেক জায়গা থেকে নানারকম বাধা আসবে। কিন্তু তোমরা এখন প্রতিবাদ করতে যেও না। **বৃহৎকাজে নেমেছ তোমরা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত সহ্য করতে হয়। সেই সহ্য এবং ধৈর্যের পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে।** তোমাদের বাবা কত পরিশ্রম করেন, কতকিছু সহ্য করেন, জান?

সকাল থেকে কতরকম ঝঞ্জাট, রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা নিয়ে চলছি। মহাপ্রভু কত পরিশ্রম করেছেন। কত অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন গৌরাঙ্গদেব। তাঁর ভক্তরাও নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। মহাপ্রভুর রক্ত আমার মধ্যে কিছু আছে তো। আছে বলেই নির্যাতনের দিক থেকে কম পাচ্ছি না। ভক্তরাও কম পাচ্ছে না। এই কয়েকদিন আগে আড়াই লক্ষের উপরে দীক্ষা হ'ল। কত বাধা-বিঘ্ন; কতরকম বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কোন বাধাতেই আটকাতে পারলো না। যে যেভাবে খুশী আমাদের উপরে বদনাম চাপাতে শুরু করেছিল। কিন্তু গঙ্গার জল তো দেখতে পাচ্ছ সামনেই। যত আবর্জনা এর উপর দিয়েই ভেসে যায়। হিন্দুদের কাছে আজও গঙ্গা অপবিত্র হয়নি। যত আবর্জনা ভাসিয়ে দিচ্ছে এই গঙ্গার বুকে। তাই আমাদের বুকের উপর দিয়েও চলছে ঝড়-ঝাপ্‌টা। আঘাত, প্রত্যাঘাত, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নির্যাতন যতরকম আছে, সব আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা শুদ্ধ পবিত্র মন নিয়ে সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছি। আমরা কোন পকেটভারী করার নীতিতে নেই। রাজনীতির দৃষ্টিতে গদী দখল করার জন্য আমরা কিছু করছি না। আমরা সমাজকে পবিত্র করতে চাই, আমরা সমাজকে সুস্থ করতে চাই। তারজন্য হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতি।

আদিবেদের প্রস্তুতি তোমাদের নিতে হবে। তোমরা কারও কথায় নির্ভর করবে না। **যত বাধা আসুক, তত তোমাদের ভাল। বাধা যত আসবে, মঙ্গল তত হবে। তার কারণ শত্রুরাই পথ দেখিয়ে দেয়। শত্রুরাই বন্ধুর কাজ করে। এরাই গল্‌তি বার করে।** তুমি মনে কর, তোমার গল্‌তি যে বার করে, সে তোমার শত্রু। তা নয়। তোমার গল্‌তি, তোমার defect যদি কেউ বার করে দেয়, তার উপরে কৃতজ্ঞ থাকবে। তাই শত্রুদের উপরেও কৃতজ্ঞ থাকবে। তারা তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছে। আগেই তোমরা সতর্ক হয়ে যাবে। সতর্ক না হলে কি করে চলবে? একটা machine যদি নষ্ট হয়, কেউ যদি machine টা ঠিক করে দেয়, কোথায় defect বুঝিয়ে দেয়, সে তোমাদের বন্ধু না? তোমাদের যন্ত্রে এই দেহযন্ত্রে, তোমাদের কার্যকলাপে যদি কেউ গল্‌তি ধরিয়ে দেয়, সে বন্ধু না? যে defect ধরিয়ে দেয়, সে হবে বন্ধু। সত্যের পথ দিয়েই তারা কাজ করছে। তাই বিপক্ষে বলতে দিতে হয়। যত বিপক্ষে বলবে, তত তোমাদের সুবিধা হবে। তোমরা গুছিয়ে নিতে পারবে।

যেখানে মাইক বাজানো উচিত নয়, সেখানে বাজাবে না। যেখানে রোগী আছে, পরীক্ষার্থী আছে, সেখানে চিৎকার করে নামগান করবে না। কারও অসুবিধা করে নামগান করবে না। তোমাদের অনেক সহ্য করে কাজ করতে হবে। অন্যেরা যা খুশী করুক, তোমরা করবে না। তোমরা করলেই ভাববে, সন্তানদলের শিক্ষা; সন্তানদলের বাবার বুঝি এইরকম শিক্ষা। তোমাদের উপরে অযথা বদনাম আসবে। অযথা দোষারোপ করবে। তোমরা সহ্য কর। প্রচার চালিয়ে যাও। নিজেদের মধ্যে ভালবাসা রাখ। বিশ্বাস ঠিক রাখ। এইটা মনে রাখবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবে না।

এই যে 'সন্তানদল', তারপরে আরো ১০-১২টি সংগঠন করা হয়েছে কাজের সুবিধার্থে। বহু হাজার হাজার লোক এইসব ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। ইস্কুলে বাপের ছেলেরা ভর্ত্তি হয় না? সেরকম ভর্ত্তি করে দিয়েছি। সেইসব স্কুলে আমার তত্ত্ব নিয়ে, আমার মতবাদ নিয়ে, আমার আদর্শ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়, বুঝানো হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরী করেছি। একই আদর্শের উপরে, একটার উপরে নির্ভর করেই সব। তোমাদের কাজ হবে, বাবার তত্ত্ব জেনে নেওয়া। বাবার তত্ত্ব যদি কেহ বুঝিয়ে দেয়, তোমাদের কত সুবিধা হবে।

পরিষ্কার সবার সঙ্গে সবাই মিল রেখে কাজ করবে। আমার তত্ত্ব জানার জন্য তোমাদের পাঠাচ্ছি ঐ ১০-১২টি সংগঠনে। ঐখানে গিয়ে বসে থাকার জন্য পাঠাচ্ছি না। দল করার জন্য পাঠানো হচ্ছে না। যে দল করবে, তাকেই ধরবে। তাকে বার করে দেবে সংগঠন থেকে। দলাদলি এখানে চলবে না। 'সন্তানদলে'ই করুক, বা যে দলেই করুক, দলাদলির কথা উচ্চারণ করলেই তাকে বার করে দেবে, কোন কথা নাই। নিজেদের মধ্যে প্রতি শনিবার, রবিবার, সোমবার আলাপ-আলোচনা করবে। সপ্তাহে একদিন ক্লাস করবে। আমার তত্ত্বসম্পর্কে, আমি কি বলতে চাই সে সম্পর্কে, অনেক টেপ-রেকর্ড আছে, সেগুলো শুনবে। আরও অনেক টেপ-রেকর্ড আছে। বহু মিটিং-এ আমি কি বলেছি, সেসব টেপ-রেকর্ড করা আছে। সেগুলি সংগ্রহ করে যতটা পারো শোনার চেষ্টা করবে।

এইতো ৯৬-টা মিটিং করে এলাম। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে। গাড়ীর তলায় পড়ে যায়; রাস্তায় শুয়ে থাকে আমার গাড়ী আটকাবার জন্য। কি তাদের অন্তরের আকুলতা, চিন্তা করা যায় না। জায়গায় জায়গায় দীক্ষা দিয়ে আসছি। রাস্তায় রাস্তায় দীক্ষা দিয়েছি। ৯৬-টা মিটিং করে আসছি। তাই তোমাদের বারবার করে বলছি, যেভাবে বলবো, সেভাবে চলবে। বাপ তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে না। বাপ তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে, বল?

— না।

— ঘোড়ার লাগামটা দেখেছ তো? হাতে কি থাকে?

— চাবুক।

— আইচ্ছা। বাপের হাতে লাগাম, ভুলে যেও না। বাপ যেখানে যাবে, তোমরা সেখানে যাবে। বাপ তোমাদের ছেড়ে যাবে না, মনে রেখো। বাপ স্বর্গের সুখের আশা করে না। সুখের আশা যদি করতে হয়, বাপ তোমাদের নিয়েই যাবে, ভুলে যেও না।

বাপ পঁচিশ বছর ক্ষেতে ছিল। পঁচিশ বছর ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে ছিল খড়ের ঘর করে। সেখানে জমি চাষ করেছি। ইট মাথায় দিয়ে কাজ করেছি। নিজে পরিশ্রম করেছি। এখন বয়সে ধরেছে। পাঁচ বছর বয়স থেকে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছি। আজও সমানে চলেছে। শিশু বয়সেই নাম দিয়েছে

'বালক গোঁসাই', 'বালক ঠাকুর', 'বালক ব্রহ্মচারী'। তখনই সবাই বলতো 'বালক ঠাকুর', 'বালক ঠাকুর'। শিশুবয়সের সেই 'বালক ব্রহ্মচারী' নামটিই আজও রয়ে গেছে। না হলে এই 'বালক ব্রহ্মচারী' নাম কোন আশ্রমের দেওয়া নাম নয় এবং তোমাদের বাবা কোন মঠে মন্দিরে মোহান্ত সেজেও বসেননি।

তোমাদের উপরে আদেশজারী রইলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে এক হয়ে থাকবে। সব জায়গায় ছেয়ে ফেলে দেবে। জায়গায় জায়গায় যাবে। পাঠশালা থেকে স্কুলে যায় না? স্কুল থেকে কলেজে যায় না? কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে যায় না? তাহলে কি সেটা ত্যাগ হয়ে গেল গিয়া? দল হয়ে গেল গিয়া? কে পাঠশালার দলে? সুতরাং বাবারই দেওয়া ক্লাস, বাবারই দেওয়া মত, বাবারই নিযুক্ত লোক, সেইভাবে সেইমন নিয়েই তোমরা ক্লাস শুনবে। খেজুর গাছ কেটে তার থেকে রস বার করে না? সেই রস তোমরা খাবে। তোমরা সেইভাবে চলবে। কোনরকম কোন ঝগড়া বিবাদ করবে না। আমি চাই আমার আদর্শ নিয়ে তোমরা চলো। তোমাদের সাথে বাপ-বেটা সম্পর্কে যেভাবে সংগঠন করেছি, এটা পারমিট, লাইসেন্স দিয়ে করা নয়। তোমাদের সাথে আমার অন্তরের সম্পর্ক, মনে রেখো।

যখন যেমন বলবো, সেভাবেই কাজ করবে। **আমার নীতি পরিষ্কার নীতি, সাফাই নীতি। আগাছা চেন না তোমরা? ক্ষেতে যে আগাছা হয়, পরগাছা থাকে, চেন না? আগাছা আর পরগাছা রাখতে নাই এই সমাজের বুকে।** আজকে তোমাদের খাওয়াইতে পারি না, শোওয়াইতে পারি না। তোমাদের আশ্রয় দিতে পারি না। কারণ তোমাদের বাবা দশটা পকেট করেন নাই। দশটা পকেট যদি করতাম, তাইলে তোমাদের ভাল খাবার দাবার দিয়ে রাখতে পারতাম। বাবার কাছে থাকবা, বাবায় যেভাবে চলেন, তোমরাও চলবে, পরিষ্কার কথা। তোমরা কষ্ট করছো। আমরা বাপ-বেটা একত্রে মরবো। তবু ধর্মের দোহাই দিয়ে তোমাদের বাবা পয়সা রোজগার করবেন না। আমরা সমাজের আগাছা আর পরগাছা পরিষ্কার করবো। হোমও করবো না, যাগযজ্ঞও করবো না। কিন্তু সামাজিকতায় থাকতে গেলে সৎ পোষাক পরে তাদের সাথে মিশবো। সৎ পোষাক পরে তাদের সাথে মিশতে হবে।

তোমরা হরিকীর্তনে যাবে। কৃষ্ণ কীর্তনেও যাবে; আল্লার কীর্তনেও যাবে। তাতে কোন বাধা নাই। তোমরা তাদের দলে টেনে নিয়ে আসবে;

সংগঠনে আনবে, সংযোগে থাকবে। হিন্দু মুসলমানের তফাৎ চিন্তা করবে না। হিন্দুরাও ঠুকবে, মুসলমানরাও ঠুকবে। এই ঠোকাঠুকি থাকবেই। আমরা এর মধ্যদিয়ে কাজ করে বেড়িয়ে যাব। তারপরে ধরবো শয়তানদের। আমার সন্তানদের হাতে লাঠি দিলে আর উপায় আছে? একধার থেকে পরিষ্কার করতে পারবে না? তাইলে আর কি আছে? শয়তান পিটানো আত্মরক্ষার জন্য; আর কিছু নয়। এইটাই ধর্ম। তোমাদের ধর্ম বৈরাগীপনা নয়। এই বৈরাগীপনার ধর্ম তোমরা করবে না। যেদিন বলবো, যেমনে বলবো, এই মন্দির, মসজিদ যা আছে, সব পরিষ্কার কর, পারবে তো?

— হ্যাঁ (সকলে সমস্বরে)।

— ব্যাস্। আমি সেইভাবেই চাই। আবার **যেদিন যখন বলবো, ধর্ণা দিয়া লম্বা হইয়া পড়ো, তাও করতে হবে। সময়োপযোগী সব করতে হবে। সব বুঝতে পারবে। আর আমার নাম দিয়ে যদি কেউ কোন কথা বলে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে সেটা মেনে নেবে না। বুঝলে তো?**

— হ্যাঁ।

— ব্যাস্। যা বলবা, সামনাসামনি বলবা। বাপ যা বলবে, সামনাসামনি বলবে। যদি মরতে হয়, আমরা বাপ-বেটা বেটী একত্র হইয়া মরবো, পরিষ্কার কথা। এই বাপ সেই বাপ নয় যে, তোমাদের আগাইয়া (এগিয়ে) দিয়া সে পালাবে। এই বাপ আগে যাবে এবং তোমরা তারপরে যাবে।

কারও কথার উপরে নির্ভর করে তোমরা চলবে না। 'বাবা, এই দিতে বলছে, সেই দিতে বলছে, টাকা দিতে বলছে,' এসব শুনবে না। বাবা এসব বলেন না। 'টাকা দাও, পয়সা দাও', বাবা কখনও এসব কিছু বলেন না। যখন বলার সময় হবে, বাবা একটা কথাই বলবেন, 'চল যাই, লাঠি ধর। শয়তান পিটাও।' আর কোন কথা নাই। তাই সংগ্রাম আর বিপ্লব। এটা মনে রেখো, এই সংগ্রাম মানুষের কল্যাণে, আত্মরক্ষাকল্পে, বাঁচার কল্পে। তোমাদের সেইভাবে প্রস্তুতি থাকবে। পেটের বাচ্চা সেইভাবে কথা বলবে। মুখ তুলে কেউ কথা বলবে না। পেটের বাচ্চা হিসাবে তোমাদের গ্রহণ করেছি। সুতরাং তোমরা সেইভাবে চলবে।

প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ব্যবহার সুন্দর করবে। 'রাম নারায়ণ রাম'

উচ্চারণ করে কথা বলবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখলে 'রাম নারায়ণ রাম' বলবে। নিজেদের মধ্যে ভালবাসা রাখবে। সেইভাবে চলবে। কারও কথার উপরে নির্ভর করবে না। যে যা খুশী বলুক, যে কোন সংগঠনের নেতা যা খুশী বলুক, বাপের একটি কথা, যখন বলবো, 'আলোচনা চক্র' ভেঙে দাও, 'সন্তানদল' ভেঙে দাও, তাই দিতে হবে। সব একদিনে ভেঙে দিতে বলবো, যদি প্রয়োজন হয়। কোনকিছু রাখবো না। আবার যখন রাখার হয় রাখবো।

সবাই এক ডাকে আসবে। এক ডাকে চলবে। যদি বলি, 'গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ো', আর কোন কথা নাই। এক এক করে বাপ-বেটা বেটী সব গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বো। সেইভাবে প্রস্তুতি থাকা চাই। সেইভাবে প্রস্তুতি নেবে। সেইভাবে কাজ করবে। এখন বাইরে হাতীর দেশে থাকতো? হাতীর দেশে থাক না?

— হ্যাঁ, থাকি।

— পোষা হাতী দিয়ে জংলী হাতীকে টেনে আনে না?

— হ্যাঁ, আনে।

— সেইভাবে ঢুকে যাও। গ্রামে গঞ্জে ঢুকে যাও। সবাইকে সেই সুরে টেনে নিয়ে আস। গ্রামাঞ্চলে ঢুকে যাও। তোমাদের মহা সুর, মহানাম, মহা স্বরগ্রাম; কি নাম?

— রাম নারায়ণ রাম।

— **এই নাম মহাকাশে লালনে পালনে রক্ষায় সর্বত্র বিরাজমান। এই নাম বৃন্দাবন মিথিলা আর মথুরার নাম নয়। এই নাম হচ্ছে মহাকাশের মহানাম মহা সুরের নাম 'রাম নারায়ণ রাম'। সেই নাম তোমরা উচ্চারণ করে বেড়িয়ে যাও। এই 'রাম নারায়ণ রামে'র অর্থ হচ্ছে লালন করা, রক্ষা করা, সংগ্রাম করা, পালন করা, শয়তানদের শায়েস্তা করা, অপরাধীদের স্থান না দেওয়া, এই হ'ল অর্থ। এতগুলি অর্থ এই 'রাম নারায়ণ রামে' আছে।** বুঝেছ তো? আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার যে ধর্ম, ধর্মের যে মূল কথা, মূল সুর তা কখনও নষ্ট হয় না

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১৬
১৭ই মার্চ, ১৯৬৮

কাম সম্পর্কে ডঃ মেঘনাদ সাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাম কি বর্জন হয়?' গোমেশ লেনে আমার সাথে আলাপ হয়েছিল। উনি ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন কুমার ঘোষের নিকট হতে আমার কথা জেনেছিলেন।

সৃষ্টির নিয়মে প্রকৃতির সুরে প্রকৃতির ধারায় পশুপাখী, জীবজন্তু আপন আপন খেয়ালে সঙ্গমে রত হয়। একটা গাভী ও ষাঁড় মিলিত হলে কে না তাকায়? একটা মেয়ের দেহে ভিজে কাপড় থাকলে, কে না তাকায়? তুমি খেলে না (সঙ্গম করলে না), তাতে কি হল? খাওয়ার ইচ্ছে তো ছিল। যেমন করেই তাকাও না কেন, কামের খেলা তো ভিতরে চলছে। যতই লুকোবার চেষ্টা কর, ভিতরে সবই তো আসছে। তুমি নিজেকে চেক্ করলে। বললে, 'গেলাম না।' কিন্তু থট্‌টা (চিন্তাটা)? থট্‌টাতো গেল। এখানকার সাধু, সন্ন্যাসীদের বেশীরভাগেরই মূত্রনালীর ব্যারাম। তারা এই ভীতিতেই সব গেল। তাই বাবাজীরা বা দ্বারীরা দ্বার রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত থাকে। কিন্তু দ্বার রক্ষা আর হয় না। শ্মশানের আগ পর্যন্ত এই দ্বার রক্ষা হয় না। হয়তো তুমি কোন নারীর সংস্পর্শে গেলে না; ছাগলের সঙ্গে গেলে। নাহলে বনে গিয়ে অন্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মিলিত হলে। রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথা আছে না? তিনি হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিভাবে হল? এখন বুঝতে পেরেছ তো? অনেকে আবার হস্তদ্বারা ফেলে দিল, হস্তমৈথুন হল; হিসি করতে করতে ফেলে দিল। রক্ষা করলো কি?

এই প্রসঙ্গে এম.এন. রায়ের (মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর) সঙ্গে

আমার আলাপ হয়েছিল। তাকে আমি বলি, ''কাম কখনও বর্জন হয় না। 'কামবর্জন করেছে', যদি কেহ বলে, তবে তার উপর আমার শ্রদ্ধা চলে যায়।''

এম. এন. রায় বলে, ''তাই নাকি? এটা থাকলে ধর্ম নষ্ট না?''

আমি বলি, ''আমার যে ধর্ম, ধর্মের যে মূল সুর, মূল কথা, তা কখনও নষ্ট হয় না।'' অনেকে শুধু বাবাজী সাজার জন্য ল্যাঙ্গট পরেছে। দেখা যায়, স্বপ্নে ল্যাঙ্গট ভিজে গেছে। একজন একটি মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। তিনি মোম জ্বালিয়ে, আগুনের মধ্যে আঙুল দিয়ে প্রেস করে, সেক্স ডাইভার্ট করলেন। এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা হয়েছিল। এটাই সূচনা ছিল। এম.এন. রায় বলে, ''আপনি তো খুব র‍্যাশানাল।''

আমি বলি, হ্যাঁ, সেইজন্যই মানুষ আমার উপর চটে যায়। তাতে আমার কি? কাম না হয় কার? বউকে দেখলে যেমন কাম পিপাসা জাগে, অপরকে দেখলেও তেমনি জাগে। এক্সরে যন্ত্র যদি থাকতো, মনের ভিতরকার চেহারাটা সব দেখিয়ে দিতাম। কামের তেষ্টা জাগাটা অপরাধ নয়। জল তেষ্টা আর কামের তেষ্টা, একই পর্যায়ের।

এই যে দেবদেবতার বিকট মূর্ত্তি, এসব সৃষ্টি করেছেন বিশেষজ্ঞরা, সমাজকে শৃঙ্খলায় আনার জন্য, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। তৎকালীন সমাজে হয়তো একজন ওয়াইফের (স্ত্রীর) পাঁচটি বাচ্চা। পাঁচজন পুরুষের পাঁচটি বাচ্চা। এই নিয়ে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতো। কেহ আর ভার নিতে চায় না। মাঝখানে এদের না খেয়ে মরার উপক্রম। প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে যেত। একজন বলে, 'এটা আমার বাচ্চা নয়, তোর।' আরেকজন বলে, 'ওটা তোর বাচ্চা, আমার নয়।' এইভাবে নানা অসুবিধা দেখা দিত। এক একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে সমাধানের এক একটা পথ তৈরী করেছে। এতেই সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা আবার **স্পিরিচ্যুয়ালিজ্‌মে** (অধ্যাত্মবাদে) ফেলে দিয়েছে। কাজেই বিশেষজ্ঞরা মূর্ত্তি সৃষ্টি করলেন হাঁ করা, দাঁত বার করা, বিকট সব চেহারা। এইভাবেই বেশীরভাগ দেবদেবতার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বললেন,

''যার যার বাচ্চা, তার তার থাকবে। তাহলে তিনি (মূর্ত্তি) খুশী হবেন। না হলে উনি টের পেলে রেগে যাবেন।'' এই ভয়েই সমাজকে শৃঙ্খলায় আনা হ'ল। কিন্তু তখনও যা, এখনও তা। ঐ যে মা লক্ষ্মীর আসনে গীতা (ধর্মগ্রন্থ) ছিল। তার মধ্যে একটুকরো কাগজে লেখা, ''খোকা, নলিনী চৌধুরীর, পিন্টু আমার স্বামীর, ঝণ্টু 'ওর' (আরেকজনের নাম) । তিন/চারটে বাচ্চার পিতা হিসাবে তিনজন পুরুষের নাম রয়েছে। কাগজের টুকরোটা স্বামীর হাতে পড়েছে। সেতো সব টের পেয়ে গেল কাগজখানা পেয়ে। এখন এর সমাধান কি? আমার কাছে এসেছে। আমি সমাধান করে দিলাম। এতো থাকবেই। সর্বকালেই ছিল। এখনও আছে। তবে এখন হয়েছে পিক পকেট। না আছে কোন্‌টা? মনে মনে যা চিন্তা করে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কেউ কইতে (বলতে) পারে না। আমি অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল। আমার হোল (সমস্ত) ফিলজফি প্র্যাক্‌টিক্যাল ও হাইজিনিক। শুধু কল্পনার জগতে ফেলে দিলে চলে? সেইজন্যই এই দেশে কোন মহাপুরুষ ধর্মের নামে সবাইকে এক করতে পারেনি। তারা তাদের নিজস্ব মতটা দিয়েছে। নিজের ধারণা, নিজের মত স্বর্গ রাজত্বের সঙ্গে যদি তুমি মিলাতে যাও, কেন মিলবে? ছেলে বেলায় একবার বাজারে গেছি সাবু কিনতে। তখন সাবু খেতাম। দেখি, দোকানে লেখা আছে, 'আজ নগদ কাল বাকী।' আমার কাছে পয়সা কিছু কম ছিল। ভাবলাম, 'আজ থাক। কাল এসে নিয়ে যাব'। কালকেও পুরো পয়সা নিয়ে যাইনি। গিয়ে দেখলাম, সেই লেখা, 'আজ নগদ কাল বাকী'। বুঝলাম, বাকীতে (ধারে) কোনদিনই নেওয়া হবে না। এইরকমই চলছে, কাম বর্জনের ক্ষেত্রেও। আজ কামবর্জন, কাল দেবদর্শন। কামবর্জনও হবে না, দেবদর্শনের আশাও সুদূরপরাহত। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানও হয় নাই। কারণ সমাজ সংসার চলেছে সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে। আমার তো কাটাছেঁড়ার ব্যাপার। আমি অপারেশন করে করে মনের সব চেহারা দেখিয়ে দিই। তারপর যা হয় হবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ধর্ম ও রাজনীতি, আলাদা কিছু নয়। নীতি হিসাবে সবই এক।

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১৬
২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৮

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, বাস্তব ছাড়া নয়। জীবনের চলার পথে যে যা কিছু করেছে, কোনটাই আধ্যাত্মিকতা ছাড়া নয়। যারা বনে গেছেন, ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তারা যে বিরাট কিছু করেছেন, এটা মনে করার কোন কারণ নেই। আবার যারা স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করছেন, তারা যে খুব মায়া মোহে পড়ে গেছেন, সেটাও ঠিক নয়। যারা বনে গেছেন, শাকপাতা যাই খান, আহার নিদ্রা কোনটাই বর্জন করতে পারেননি। যারা আশ্রমে বাস করেন, তারা তোমাদের চেয়ে বড় নয়। যে যেখানে আছেন, সেটাই তাদের বাসস্থান, সেখানে তারা আছেন। যারা আশ্রমে গেলেন, সেখানেও স্কুল-কলেজ, পড়াশুনা, কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া সবই আছে। অনেকে আশ্রমে গিয়ে নাম পরিবর্ত্তন করে গদানন্দ, সদানন্দ নাম লিখিয়েছেন। তারা বেশী কি করলেন? কি ত্যাগ করলেন? এই যে ত্যাগ, বেশভূষায় বাহ্যিক ত্যাগ, এটা কোন ত্যাগই নয়। এ যেন বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সংসারে যে যা কিছু করছে, কোনটাই আধ্যাত্মিকতা ছাড়া নয়। আমি অনেককে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের মা বাবার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছি। এতে অনেকে আমার উপর বিগড়িয়ে গেছে।

ধর্ম ও রাজনীতি, আলাদা কিছু নয়। নীতি হিসাবে সবই এক। একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— নাক, কান, চোখ, মুখ ইত্যাদি। নাম আলাদা হতে পারে, শরীরের যে কোন অংশকে ধরলে দেহকেই ধরা হয়; একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশ মাত্র। পাহাড়ে এক সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল, 'রাজনীতি আর ধর্মনীতি আলাদা।'

আমি বললাম, একই পৃথিবীর (ভূগর্ভের) সন্তান আমরা। একই প্রকৃতিজাত সন্তান হিসাবে আমাদের জন্মগত দায়িত্ব রয়েছে। তা দিয়েই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। যারা বসে বসে অন্যের সর্বনাশ করছে, ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছে আমাদের, তারা তো আমাদের বন্ধু নয়। আমরা দেবদেবতার পূজা কেন করছি? দেবদেবতাকে স্মরণ করছি কেন? তাঁরা অসুরনিধনকল্পে যে যে অস্ত্র ধারণ করেছেন, আমরা সেইসব অস্ত্রকে সাথের সাথী করে, যারা দেশের ক্ষতি করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো। শয়তান কারা? যারা দেশকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে, তারাই শয়তান। বেদ তাদের কর্ত্তন করতে বলেছে। বেদ বলেছে, ''যারা অন্যায় করছে, অবিচার করছে, চোখের সামনে দেখেও যদি তোমরা অবিচারের প্রতিকার না কর, তাহলে তোমরাও দায়ী হচ্ছ।''

আমরা সেই সুরে সুর দেব। সেই নাদধ্বনির সুরের সাথে একই সুরে, একই ধ্বনিতে রয়েছি আমরা। সেই গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনির (নিনাদের) সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা সবাইকে এক করার চেষ্টা করবো। যদি তারা বাধা দেয়, সংশোধনের চেষ্টা করবো। তাতে কাজ না হলে তখন অস্ত্র প্রয়োগ করবো। এতে কোন অপরাধ হবে না। দৈনন্দিন নানা সমস্যায় জনগণ জর্জরিত। চাল নেই, ডাল নেই, জল নেই— চারিদিকে শুধু অভাব। প্রকৃতির নিয়মে অভাব হতে পারে না। আমাদের জীবনে দুই টাকা, আড়াই টাকা মণ চাউল দেখেছি। দুধের সের দুই পয়সা। আর আজ, কি অবস্থা। কেন এত দাম? ক্ষেত্রের পরিধি যেমন বেড়েছে, সেই অনুযায়ী ফলনও বেড়েছে। একজন লোকও অনাহারে থাকতে পারে না। অভাবের দায়ে কেন লোক মারা গেল? সঠিক কারণ খুঁজে বের কর। অসুখে মারা গেল কি না, খোঁজ কর। খুঁজে যদি দেখ, অভাবই কারণ, সেই কারণের মূল উৎপাটন কর। অভাবের মূলে যারা, তাদের ধ্বংস কর। সবাই মিলে মায়ের (কালীর) খড়্গটি ধরে শত্রু বলি দেও।

সৃষ্টির নিয়মে অভাব থাকতে পারে না। বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তনে দুধ হয়। সমাজে কেন অভাব হলো, সেই কারণের

অপারেশন কর। অপারেশন করা, ক্ষতি করা নয়। এতে ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধন করা হয় না। এম.এন. রায়ের (মানবেন্দ্র নাথ রায়ের) নাম শুনেছ? বিরাট জ্ঞানী ব্যক্তি। তার সাথে চার ঘণ্টা আলাপ হয়েছিল। তারপর সে আমার পায়ে পড়লো। সে কারও কাছে মাথা নোয়ায়নি। আমি তাকে বলেছিলাম, ''এই যে ঝড়-বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম হচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতির নিয়মে। কোন্‌টা তোমরা নূতন করে সৃষ্টি করেছ? ক্ষুধার টানে খাদ্য জোগাড় করেছ। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা না থাকলে কি কিছু করতে? চাহিদার সাথে সাথে আমরা মাঠে নামবো। এই যে গড়ের মাঠ পড়ে রয়েছে, ক্ষেত কর। এই ভূগর্ভের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য এক ইঞ্চি জমিও নষ্ট করা উচিত নয়। যে সমস্ত জায়গা খালি পড়ে রয়েছে, কাজে লাগালে অভাব থাকতে পারে না।''

বেদ বিজ্ঞানসম্মত। এখানে কতগুলো সাধু, গুরু এসে হোম, যাগ-যজ্ঞ করছে; ধর্মের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আমি প্রতিবাদ করেছি বলেই তো আমার নামে কেস। সামান্য ১৩ কাঠা জমির জন্য আমার নামে কেস ঠুকে দিল। কারণ আমার সঙ্গে তাদের বনে না (বনিবনা হয় না)। আমায় কি আটকিয়ে রাখতে পারবে? আমি দেশকে দেশ জ্বালিয়ে যাবো। আমি সবার সঙ্গে মাঠে নামতে চাই। তাই তো বলেছে, 'মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।' আমি তো আশ্রম করতে পারি না। শনির দশা, রাহুর দশা বলে যদি টাকা রোজগার করতে হয়, এরচেয়ে পিক্ পকেট করা ভাল। আমি বিরাট কাজে নেমেছি। নীতির ভিতর দিয়ে আমি কাজ করে যাব। আমার রক্তে এখনো টগবগানি আছে। আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসতে জানি।

তোমরা ন্যায়ের পূজারী, তোমরা গুণের পূজারী। তোমরা এস। পথে ঘাটে নাবো। মৃত্যুকে তো কেউ রোধ করতে পারে না। মৃত্যু যখন আসে, স্বামীতো আটকাতে পারে না স্ত্রীকে। আমাদের হাতে ত্রিশূল রয়েছে, গদা রয়েছে; প্রেম রয়েছে। যেখানে প্রেম দিয়ে হয়, সেখানে প্রেম দাও। শাস্ত্রকে স্মরণ করে, নীতিকে আশ্রয় করে আমরা নীতির পথে যাবো। সবাইকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবো। একমাত্র দেশের জন্য,

নীতির জন্য, জাতির জন্য আমরা এগিয়ে যাব। 'জাতিকে বাঁচাও, নীতিকে বাঁচাও', তবেই শাস্ত্রকে রক্ষা করা যাবে। সেই চিন্তাতেই জপ কর, ধ্যান কর। একমাত্র শান্তির জন্য অগ্রসর হয়ে যাবে। যারা মূলাধার হতে সহস্রারে নিমগ্ন থাকে, তারা দেখে। আমি অনন্ত মহাকাশে ব্যাপ্তমান হয়ে সবার সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। এটা কখন আসে? যখন আত্মা উর্দ্ধ চিন্তায় রত হয়। তোমরা এইভাবে নীতিকে রক্ষা কর, জাতিকে রক্ষা কর, দেশকে রক্ষা কর। এটাই সাম্যনীতি, এটাই হ'ল সাম্যবাদ। 'কম্যুনিজম্' বেদের কথা। সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমসুরে যারা অগ্রসর হচ্ছে, তারাই কম্যুনিষ্ট।

এক কাজে একত্রিত হয়ে জগৎকে এক সুরে আন। কণা কণা মিলিত হয়ে, অজস্র কণা নিয়েই হয় বৃষ্টি। আজ দেশ টলায়মান। নীতিগত, জাতিগত সব দিকেই টলায়মান। সব রাজনৈতিক দলে টলায়মান অবস্থা। তাই তোমরা মহানাম নিয়ে, ত্রিশূল নিয়ে এগিয়ে চল। তাই সন্তানদল— জগতের সন্তানদের সেবা কর। কেউ যাতে অনাহারে না থাকে, সবার মুখে যাতে অন্ন দেওয়া হয়, তার চেষ্টা কর। পুঁজিবাদীদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে এস। জাহাজ যখন ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়, তখন বলে, 'এক কাত হবেন না।' আজ বড় বাজারে শিল্পপতিদের হাতে এককাত হয়ে রয়েছে দেশ। সমাজকে এককাত হতে দিও না। সঞ্চয় করা বন্ধ কর। সঞ্চয় না করলে আজই চার টাকা/পাঁচ টাকা মণ চাল হয়ে যাবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) মধু বিশ্বাস, বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮) বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫